গ্রামাঞ্চলের যীশু

শাহরিয়ার কবির

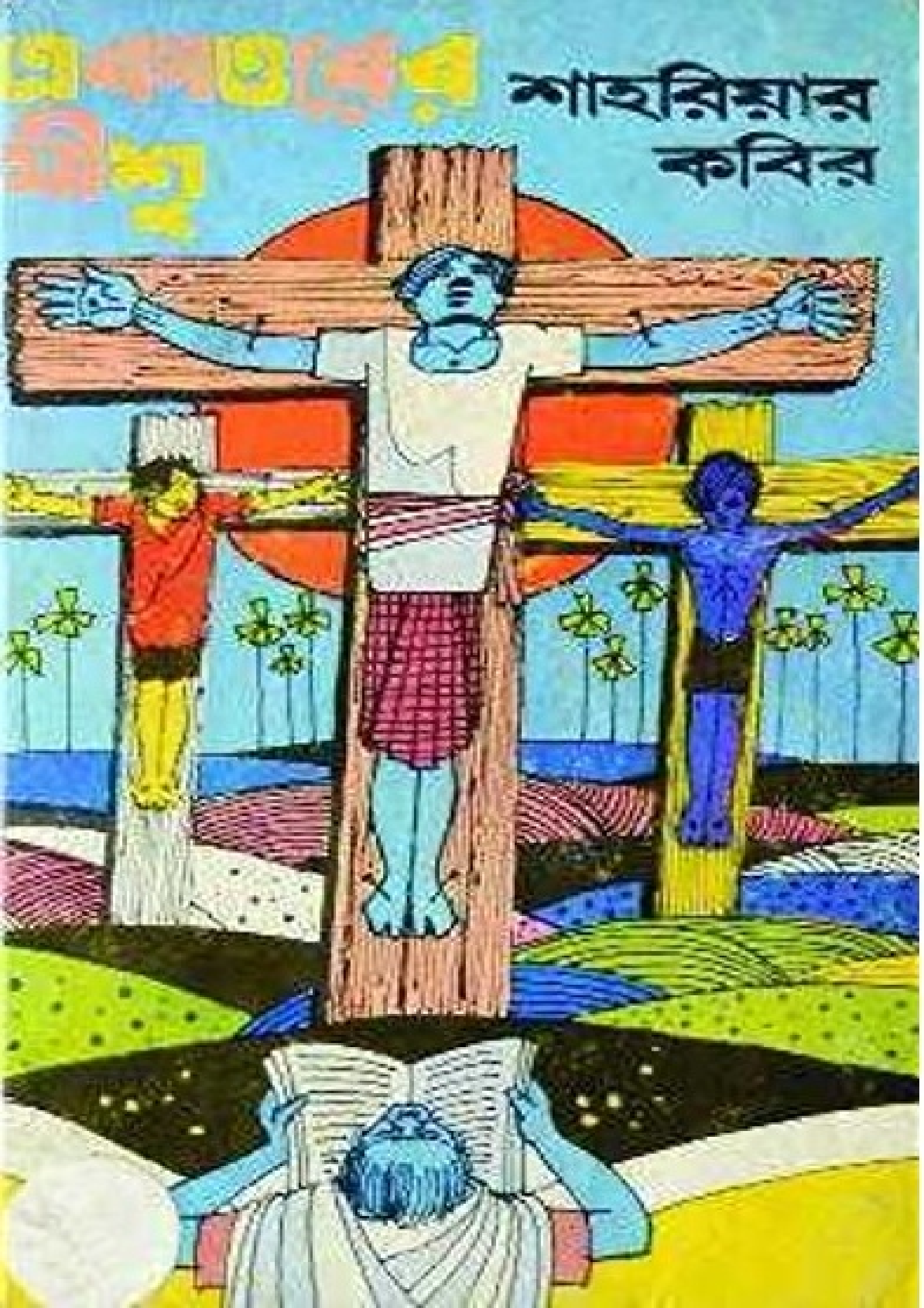

একাত্তরের যীশু

দক্ষিণের শহর আর গ্রামগুলো পোড়াতে পোড়াতে পাঞ্জাবী সৈন্যরা ধীরে ধীরে উত্তর দিকে এগিয়ে আসছিলো।খবরটা শুনে মে মাসের প্রথম থেকেই গ্রামের লোক আরো উত্তরে শালবনের দিকে সরে যেতে লাগলো।অনেকে সীমান্ত পেরিয়ে কুচবিহার আর পশ্চিম দিনাজপুরে চলে গেলো।

সীমান্ত বেশি দূরে নয়।অনেকে ওপারে গিয়েও নিয়মিত যাওয়া আসা করছিলো।জুনের মাঝামাঝি যখন সবাই নদীর ওপারের ছোট্ট শহরটাকে দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখলো, তখন যারা যাবার তারা একেবারেই চলে গেলো।থেকে গেলো জামাত, মুসলিম লীগের কিছু দালাল আর কয়েকজন বুড়ো।গির্জার ঘন্টা টানতো বুড়ো ডেসমন্ড ডি রোজারিও। সে ছিলো থেকে যাওয়া বুড়োদের একজন।

এতোদিন ফাদার মার্টিন ছিলেন গির্জায়।যশোরে পাঞ্জাবীরা মিশনারিদের মেরেছে এই খবর শুনে তিনিও কিছুদিন আগে শহরে চলে গেছেন। বুড়ো ডেসমন্ডকে ডেকে বলেছিলেন, উহারা মিশনারিদিগকেও হত্যা করিতেছে। আমি শহরে যাইতেছি। তুমি বিপদ দেখিলে ইন্ডিয়া চলিয়া যাইও।ইন্ডিয়ার মানুষ আমাদের অসহায় মানুষদিগকে আশ্রয় দিয়াছে।ঈশ্বর উহাদের মঙ্গল করিবেন।এই বলে ফাদার বুকে ক্রস এঁকেছিলেন।

বুড়ো ডেসমন্ড মাথা নিচু করে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে কাটতে জবাব দিয়েছিলো মুই আর কুণ্ঠে যাবেক ফাদার।

অনেক ভেবেছিলো ডেসমন্ড বুড়ো। আসলে সে যাবেইবা কোথায়! তার স্বজাতি সাঁওতালরা যখন সেখানে খুশি অনায়াসে চলে যেতে পারে।ওদের রক্তের সকল অণুতে মহুয়ার মতো মিশে আছে যাযাবরের নেশা।কিন্তু ডেসমন্ডের সেই নেশা কেটে গেছে বহু বছর আগে।নিজেকে এখন মনে হয় ঝুরি নামানো বুড়ো বটগাছের মতো, সারা গ্রামে যার শেকড়-বাকড় ছড়িয়ে পড়েছে।

গ্রামে যখন এই গির্জা প্রতিষ্ঠিত হলো, ডেসমন্ড তখন বারো বছরের বালক। পাদ্রী ছিলেন ফাদার নিকোলাস। তিনিই ডেসমন্ডকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন–প্রভুর স্থান ছাড়িয়া কোথাও যাইও না।প্রভু তোমাকে রক্ষা করিবেন।

সেই থেকে ডেসমন্ড এই গির্জায় পড়ে আছে। গির্জার পাশে সবুজ ঘাসের আঙিনা। দেয়ালের ওপাশে সারি সারি কবর। সবুজ আঙিনা আর কবরের মাঝে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের গায়ে লাগানো ছোট্ট দু'টো ঘর। ছাদটা লাল টালির। দেয়ালগুলো সাদা চুনকাম করা।এই ঘর দুটো ডেসমন্ডের।সারাদিন সে এখানেই থাকে, আর গির্জার ঘন্টা বাজায়।ওর মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র কাজের দায়িত্ব প্রভু ওকেই দিয়েছেন।

আগে ডেসমন্ড সকালে গির্জার বাগানে কাজ করতো।গির্জার ভেতরের ঝাড়ামোছাগুলো শেষ করে রাখতো। বিকেলে ছোট্ট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতো। প্রভু ছোটদের ভালোবাসতেন। বহুদিন বাইবেল থেকে ফাদাররা পড়ে শুনিয়েছেন, যীশু কহিলেন,

শিশুদিগকে আমার নিকট আসিতে দাও। বারণ করিও না। কারণ স্বর্গরাজ্য এইমত লোকদেরই।'

প্রায় জনশূন্য গ্রামগুলোতে মানুষের সাড়াশব্দ একেবারেই নেই।দু'একজন বুড়ো, যারা এখনো গ্রামে আছে, তারা ছোটদের মতো সারা গ্রাম মাতিয়ে রাখতে পারে না।বুড়ো ডেসমন্ডের বুকে শুধু যন্ত্রণার ঢেউ উত্তাল হয়।নিবির দাদু, হরিপদের খুড়ো যখন এসে শহরে শত্রু সৈন্যদের অত্যাচারের কথা বলে, ডেসমন্ড তখন বুকে জমে থাকা কান্না থামিয়ে রাখতে পারে না।

সারাটা জুলাই মাস বুড়ো ডেসমন্ড একা একা কাটালো।বাগানের কাজে আগের মতো উৎসাহ পেতো না।তবু সকালটা গির্জার কাজে ব্যস্ত থাকতো।বিকেলগুলো ওর কাছে ভয়াবহ মনে হতো।গ্রামের সেই উচ্ছল ঝর্ণার মতো ছেলেমেয়েগুলো কোন শয়তানের যাদুবলে কোথায় কীভাবে যে হারিয়ে গেলো–ডেসমন্ড যতো ভাবে ততো তার বুকে দুঃখের পাহাড় জমে। গির্জার প্রাঙ্গণে কতগুলো শিরিষ গাছ ছিলো। অন্য সময়ে গাছগুলোতে রঙবেরঙের পাখির মেলা বসতো।এখন পাখিরা আর শিরিষের ডালে গান গেয়ে ছুটোছুটি করে না।আঙিনার সবুজ ঘাসের কার্পেটে প্রজাপতিরা নানা রঙের নকশা আঁকে না। শিরিষের পাতা গলিয়ে বিকেলের মরা রোদ গির্জার গায়ে জড়িয়ে থাকে। বিশাল এক শূন্যতা সারা গ্রাম জুড়ে হা হা করে কাঁদতে থাকে। বাতাসকে মনে হয় কোনো ডাইনীর অভিশাপের নিঃশ্বাস। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বুড়ো ডেসমন্ড শুধু ছটফট করে।ভাবে ঈশ্বর কেন ওকে এই নরকে ঠেলে দিলেন!

যখন সময়গুলো একেবারেই অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন ডেসমন্ড জানালার তাকের ওপর থেকে, ফাদার গাঙ্গুলীর দেয়া মথি লিখিত সুসমাচার'খানা নামিয়ে আনে।ভালো মতো পড়তে পারে না ডেসমন্ড।চোখে ঝাঁপসা দেখে।তবু কোনো রকমে বানান করে জোরে জোরে পড়ে–ইতিমধ্যে পিতর বাহিরের প্রাঙ্গণে বসিয়াছিলেন। আর একজন দাসী তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, তুমিও সেই গালীলীয় যীশুর সঙ্গে ছিলে ।কিন্তু তিনি সকলের সাক্ষাতে অস্বীকার করিয়া কহিলেন, তুমি কি বলিতেছ আমি বুঝিতে পারিলাম না।তিনি ফটকের নিকট গেলে আরেক দাসী তাঁহাকে দেখিয়া সেস্থানের লোকদিগকে কহিল, এ ব্যক্তি সেই নাযারথীয় যীশুর সঙ্গে ছিল।তিনি আবার অস্বীকার করিলেন, দিব্য করিয়া কহিলেন, আমি সে ব্যক্তিকে চিনিনা। অল্পক্ষণ পরে যাহারা নিকট দাঁড়াইয়াছিল তাহারা আসিয়া পিতরকে কহিল, সত্যই তুমি তাহাদের একজন।কেননা তোমার ভাষা তোমার পরিচয় দিতেছে।তখন তিনি অভিশাপপূর্বক শপথ করিয়া বলিতে লাগিলেন আমি সে ব্যক্তিকে চিনিনা।তখনই কুকুড়া ডাকিয়া উঠিল।তাহাতে যীশু এই যে কথা বলিয়াছিলেন, কুকুড়া ডাকিবার পূর্বে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করিবে, তাহা পিতরের মনে পড়িল।এবং তিনি বাহিরে গিয়া অত্যন্ত রোদন করিলেন।'

ডেসমন্ড যতোবার বাইবেল পড়ে যীশুখৃস্টের ক্রুসবিদ্ধ হবার ঘটনার কথা ভাবে, ততোবার ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে।তবু সে জোরে জোরে বাইবেল পড়ে।ওর মনে হতো বাইবেলের পবিত্র শব্দগুলো, শয়তানের মতো ভয়ঙ্কর নিরবতাকে তাড়া করে

ফিরছে।গির্জার প্রাঙ্গণে অন্ধকার নামা পর্যন্ত ডেসমন্ড বাইবেল পড়ে।নিরবতাকে ও ভয় করে, একই সঙ্গে ঘৃণাও করে।

আগস্টের শেষে এক বৃষ্টিভেজা রাতে ওরা কয়েকজন এলো বুড়ো ডেসমন্ডের ঘরে। হারিকেনের ম্লান আলোয় ডেসমন্ড তখন গির্জার আইকন পরিষ্কার করছিলো।দরজায় হালকা পায়ের শব্দ শুনে চোখ তুলে তাকালো।দেখলো তিনটি ছেলে, বৃষ্টিতে ভেজা সারা শরীর, চুলের ডগা বেয়ে মুক্তোর দানার মতো জল গড়িয়ে পড়ছে।ওদের উজ্জ্বল চোখগুলো হারিকেনের ম্লান আলোতেও চকচক করছিলো। কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ডেসমন্ডের মনে হলো, ওরা যেন তিনজন দেবদূত, স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে।তারপর সে এতো বেশি অভিভূত হয়ে গেলো যে, আর কোনও কথাই বলতে পারলো না।

ওরা তিনজন একে অপরের মুখের দিকে তাকালো। একজন একটু হেসে বললো, আমরা আজ রাতে তোমার এখানে থাকবো ডেসমন্ড দাদু।

আরেকজন বললো, তোমাদের গায়ের দাশু খুড়ো বলেছে, তুমি খুব ভালো লোক।

স্বর্গের দেবদূত ওর কাছে এসেছে, ওর ঘরে থাকতে চাইছে ডেসমন্ড কী বলবে সহসা কিছুই ভেবে পেলো না।তারপর এলোমেলো ভাবে বললো, হায় হায়, থাকতি কেনে দিবেক নেই।তোমাদের কষ্ট হতিছে বাছা।আগুনের ধারে বস।সব ভিজ্যে গেছে।

হাতের ব্যাগটা একপাশে নামিয়ে রেখে ওরা ছোট্ট উনুনটির পাশে গিয়ে বসলো। বললো, দাশু খুড়ো তোমার কথা অনেক বলেছে ডেসমন্ড দাদু। বলেছে, তুমিই আমাদের সাহায্য করতে পারো।তোমার মতো ভালো লোক এ গায়ে আর নেই।

বিরাশী বছরের বুড়ো ডেসমন্ড লজ্জায় লাল হলো। স্বর্গের দেবদূত ওকে একি কথা শোনাচ্ছে! মাথা নেড়ে বললো, না না, সেটি ঠিক বুলে নাই।সাহাইয্য লিচ্চয়ই করিব। ঈশ্বর তুমাদের মঙ্গল করিবেন।

অনেক রাত অবধি বুড়ো ডেসমন্ডের সঙ্গে ওদের কথা হলো।ডেসমন্ডের মনে হলো, দেবদূতরা ওর জন্যে স্বর্গের বাণী বয়ে এনেছে।ওরা জানে, শিরিষ গাছে পাখিরা কেন গান গায় না, ঘাসফুলের প্রজাপতিরা কেন আর আসে না, পৃথিবীর সমস্ত আনন্দের শব্দ আর রঙ কোথায় হারিয়ে গেছে।ওরা আনন্দের হারিয়ে যাওয়া শব্দকে ফিরিয়ে আনবে। শয়তানের বিষাক্ত যন্ত্রণার ছায়া পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেবে।শিরিষের ডালে আবার পাখিরা গান গাইবে।মুগ্ধ হয়ে ডেসমন্ড ওদের কথা শোনে।ওর ঘোলাটে চোখে আনন্দ নেচে বেড়ায়।বার বার বলে, ঈশ্বর তুমাদের মঙ্গল করিবেন।

স্বর্গের দেবদূত হাসতে হাসতে ওকে বলে, তোমাকে আমরা শিখিয়ে দেবো কি করে গ্রেনেড মারতে হয়, আর রাইফেল চালাতে হয়।

আনন্দে উত্তেজনায় ডেসমন্ড শুধু বলে, লিচ্চয়ই, লিচ্চয়ই।

এরপর দিনগুলো যে কীভাবে কাটলো ডেসমন্ড বুড়ো আর হিসেব রাখতে পারলো না। স্বচ্ছ সরোবরে হাঁসের মতো তরতর করে সময় বয়ে যেতে লাগলো।সকালে লাঠিতে

ভর দিয়ে ও নদীর তীর অবধি চলে যায়।কোনোদিন আবার একেবারে শহরে ঘুরে ঘুরে সব দেখে আসে।পাহারারত পাঞ্জাবী সৈন্যরা কেউ ওকে উপেক্ষা করে, কেউ রসিকতা করে।রাতে দেবদূতের দল আসে ওর কাছে।সারা ঘর আলো হয়ে যায়।ওর কানে গির্জার প্রার্থনা সঙ্গীত বাজতে থাকে।ওদের সঙ্গে ওর কথা হয়।তারপর গভীর রাতে ওরা চলে যায়।দূরে শহরে বিস্ফোরণের শব্দ হয়।মেশিনগান গর্জন করে, আবার কোথাও গ্রেনেড ফাটে।গভীর আনন্দ আর উত্তেজনায় ডেসমন্ড ডুবে যায়।একটা গ্রেনেডের শব্দ একশটা হয়ে ওর কানে গির্জার ঘন্টার মতো বাজতে থাকে।ডেসমন্ডের চোখে আর ঘুম নামে না।শেষ রাতে ওরা এসে বলে, আমরা যাচ্ছি।ভালো থেকো ডেসমন্ড দাদু।আবার দেখা হবে।

ওরা চলে যাবার পর আবার শয়তানের মতো কদাকার সেই নিরবতা ডেসমন্ডকে গলা টিপে মেরে ফেলতে চায়।লাঠিতে ভর দিয়ে ও গ্রামের ভেতরে যায়।হরিপদর খুড়ো অনেক দিন ধরে বাতের ব্যথায় কষ্ট পাছে।কটা আকন্দ পাতা তুলে নিয়ে হরিপদর তালা বন্ধ ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকে, হরিপদর খুড়ো ঘরে আছো? ও হরিপদর খুড়ো? কেউ কোনো সাড়া দেয় না।

আরেকটা শেকল তোলা দরজার সামনে গিয়ে ডেসমন্ড ডাকে, নিবির দাদু? ও নিবির দাদু?

উঠোনের কোণ থেকে হাড় বের করা একটা লোমঝরা কুকুর শুধু একবার মাথা তুলে ওকে দেখে।গ্রামের সবাই চলে গেছে।ভীষণ ভয় পায় ডেসমন্ড।লাঠিতে ভর দিয়ে কাঁপা কাঁপা পায়ে আবার গির্জায় ফিরে আসে।অসময়ে গির্জার ঘন্টা বাজায়।ডেসমন্ডের মনে হয়, শব্দের অভাবে ও বুঝি পাগল হয়ে যাবে।

কখনো নদী পেরিয়ে ওপারের গ্রামে চলে যায় ডেসমন্ড।সেই গ্রামের অনেকে ওকে চেনে।এখনো সবাই গ্রাম ছেড়ে যায়নি।ভেবেছিলো পাঞ্জাবীরা বুঝি এতো ভেতরে আসবে না।ওরা ডেসমন্ডকে বলেছিলো একা গির্জায় পড়ে না থেকে ওদের গ্রামে এসে থাকতে।ম্লান হেসে ডেসমন্ড মাথা নেড়েছে।ও জানে শেকড় উপড়ে ফেললে গাছ বাঁচে না।

এক রাতে ডেসমন্ড দেখলো নদীর ওপারের ছোট্ট গ্রামটাও দাউ দাউ করে জ্বলছে। অসহায় মানুষের কান্না আর আর্তনাদের আবছা শব্দ ভেসে আসছে বাতাসে।ডেসমন্ড কি করবে কিছুই ভেবে পেলো না।গির্জার ভেতর ছুটোছুটি করলো ফাঁদে আটকা পড়া ভয় পাওয়া ইঁদুরের মতো।কখনো যীশু খৃষ্টের মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে হাত জোড় করে বিড় বিড় করে কি যেন বললো।কখনো আবছা আর্তনাদের শব্দে ও ছিটকে বেরিয়ে এলো।ওর চোখের সামনে ঘর বাড়ি জ্বলছে, গাছ পালা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, মানুষ মরছে।ওর বুকের ওপর হাতুড়ি দিয়ে কেউ যেন পেরেক ঠুকছে, হাতে পায়ে পেরেক ঠুকে ওকে ঝুলিয়ে দিচ্ছে ক্রুসকাঠে।

সারা রাত ডেসমন্ড কাঁদলো।ওর কান্নায় রাতের অন্ধকার গলে গেলো।গ্রামের আগুন নিভে গেলো।সূর্য ওঠার আগে ডেসমন্ড লাঠিতে ভর দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে গেলো সেই গ্রামে।

ও জানতো গ্রামের একজন মানুষও বেঁচে নেই। শয়তানরা এভাবেই গরিব দুঃখী মানুষদের মেরে ফেলে। চারপাশে ও তাকিয়ে দেখলো শুধু লাশ আর লাশ। তখনো কোথাও কয়লার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে। বাতাসে লাশের পোড়া গন্ধ। বুড়ো করমআলীর ছোট নাতনিকে একটা কাপড়ের পুতুল কিনে দিয়েছিলো ডেসমন্ড।তাকিয়ে দেখলো পোড়া ঘরের নিচে চাপা পড়েছে ওরা সবাই। কেউ বেঁচে নেই। করমালীর নাতনির হাতে ধরা পুতুলটাও পুড়ে গেছে।

ওরা এভাবে পড়ে থাকলে ওদের শেয়াল, কুকুর আর শকুন টেনে ছিঁড়ে খুবলে খাবে। ডেসমন্ড ঠিক করলো সবাইকে কবর দেবে ও।সবার জন্য প্রার্থনা করবে ঈশ্বরের কাছে। ঈশ্বরের কাছে সব মানুষই সমান।

কোদাল আনার জন্য গির্জায় যাচ্ছিলো ডেসমন্ড । হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। কৃষ্ণচূড়া গাছের আড়ালে বসে আছে ছোট্ট একটা মেয়ে।ডেসমন্ডের মনে হলো বুঝি ও চোখে ভুল দেখছে।চোখ কচলে আবার দেখলো।মেয়েটা ভয়ে কুঁকড়ে বসেছিলো নদীর দিকে মুখ করে।যেন কেউ আসবে ওকে নিতে।

পায়ে পায়ে মেয়েটার কাছে এগিয়ে গেলো ডেসমন্ড। ওর পায়ের শব্দ শুনে চমকে তাকালো মেয়েটা।নরম গলায় ডেসমন্ড জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে?

মেয়েটা কোনো কথা বললো না। ওর দু'চোখে পৃথিবীর সব ভয় এসে বাসা বেঁধেছে। ডেসমন্ড আরো নরম গলায় বললো, তুমার নাম কী?

মেয়েটা কথা বলতে চাইলো, পারলো না।ডেসমন্ডের ভীষণ কষ্ট হলো।মেয়েটার পাশে বসে ওকে কাছে টেনে আদর করে আবার বললো, তুমার নাম কী গো মা?

মেয়েটা কথা বলতে চাইলো।আঁ-আঁ শব্দ হলো।মাথা নাড়লো সে।

ডেসমন্ডের বুকটা কেঁপে উঠলো–তুমি কথা বুইলতে পারো না? বলে মেয়েটাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরলো।তারপর ডুকরে কেঁদে উঠলো।ডেসমন্ডের সঙ্গে বোবা মেয়েটাও কাঁদলো।

মেয়েটাকে ওর ঘরে রেখে সারা দিন ধরে ডেসমন্ড পাশের পোড়া গ্রামে কবর খুড়লো। এক এক করে সবাইকে কবর দিলো।গির্জায় অনেক মোমবাতি ছিলো।রাতে মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে কবরগুলোতে মোমবাতি জ্বেলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলো। ডেসমন্ড জানে শয়তানের হাতে যারা মারা যায় স্বর্গ তাদেরই জন্য।

কয়েকদিন পর আবার ছেলেরা এলো। ডেসমন্ড ওদের বললো বোবা মেয়েটাকে ও কীভাবে কুড়িয়ে পেয়েছে।ছেলেদের নরম চেহারা কঠিন হয়ে গেলো।বললো, আমরা জানি পাকিস্তানী সৈন্যদের কারা গ্রামের পথ চিনিয়ে দিয়েছে। ওদের কাউকে আমরা ক্ষমা করবো না।

যাবার আগে ওরা সবাই মেয়েটাকে আদর করলো। ডেসমন্ডকে বললো, যেদিন আমাদের দেশ স্বাধীন হবে সেদিন ও কথা বলবে।

ডেসমন্ড হেসে মাথা নেড়ে সায় জানালো। বললো, তুমরা কুন চিন্তা কইরো না। উরে আমি কথা শিখামু।

শেষ রাতে ডেসমন্ড দূরের শহরে বিস্ফোরণের শব্দ শুনলো। ওর বুকের ভেতরটা হালকা মনে হলো। মেয়েটাকে সকালে বললো, মা, আর কুন ডর নাই।

ডেসমন্ড ভেবেছিলো শয়তানের দল বুঝি শহর ছেড়ে চলে গেছে। রাতে আকাশ হঠাৎ করে লাল হয় না। গুলির শব্দও শোনা যায় না। শেষ রাতে ওদের বিস্ফোরণের শব্দে বুকটা ভরে যায়। বোবা মেয়েটাকে এক সকালে বললো, আস, আমরা বাগানের আগাছা তুলি। আবার ফুলের গাছ লাগাই।

ওরা দুজনে মিলে গির্জার বাগানে মাটি কোপালো। গাঁদা, কসমস আর সূর্যমুখীর বীজ ছিটালো। রোজ ভোরবেলা বোবা মেয়েটাকে নিয়ে বাগানে বসে থাকে ডেসমন্ড। একটা চারা গজালে দু'জন আনন্দে মেতে ওঠে। এ যেন এক নতুন খেলা।

অবশেষে একদিন সেই ভয়ঙ্কর সময়ের মুখোমুখি হলো ডেসমন্ড বুড়ো। শেষ রাতে বিস্ফোরণের শব্দ শুনে ওরা গভীর আনন্দে ঘুমিয়েছিলো। তখন আকাশের অন্ধকার সবেমাত্র ফ্যাকাশে হতে শুরু করেছে—গির্জার বড় ফটকের বাইরে শব্দ শুনে ওর ঘুম ভেঙে গেলো। কিছু উত্তেজিত আর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর—কথা বোঝা যাচ্ছে না।

মেয়েটাকে ঘরে লুকিয়ে রেখে লাঠি হাতে বেরিয়ে এলো ডেমন্ড। ততোক্ষণে ফটকে করাঘাত পড়েছে। ভারি ফটকটা ধীরে ধীরে খুলে বাইরে তাকিয়ে যা দেখলো তাতে ওর সমস্ত শরীর পাথরের মতো জমে গেলো। কয়েকজন হিংস্র মানুষ ওদের ঘিরে পাশবিক উল্লাসে ফেটে পড়েছে। ওরা তিনজন, স্বর্গের সেই দেবদূত হাতগুলো বাধা, সারা শরীরে ধুলো আর রক্তের দাগ নিয়ে একদল ভয়াল নেকড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলো।

একজন নেকড়ে ধারালো গলায় বললো, এই বুড়ো, এগুলোকে চিনিস? তোদের গির্জার পাশে ঘুরছিলো।

ডেসমন্ড আবার দেখলো ওর প্রিয় দেবদূতদের, যারা ওর জন্যে স্বর্গের বাণী বয়ে আনতো। ডেসমন্ড অবাক হয়ে চেয়ে দেখলো, ওদের চোখে এখনো স্বর্গের আলো খেলা করছে। বিড় বিড় করে বললো, ওরা স্বর্গের দেবদূত।

নেকড়েরা আবার গর্জন করে উঠলো, কিরে কথা বলছিস না কেন? আগে কখনো দেখিসনি এগুলোকে?

ডেসমন্ডের গলাটা কেঁপে গেলো। বললো, না। তারপর লাঠিতে ভর দিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে হেঁটে ওর ঘরে চলে গেলো। পবিত্র বাইবেলে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙে পড়ে বার বার বললো, না, প্রভু না—।

বোবা মেয়েটা ভয়ে কুঁকড়ে বসে থাকলো ঘরের কোণে।

বাইবেলের ভেতর থেকে ক্রুসবিদ্ধ যীশুর অন্তিম বাণী শুনতে পেলো ডেসমন্ড। প্রভু ক্রুসের উপর থেকে বলছেন, ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর! তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ

করিয়াছ? এতটুকু শব্দ না করে ডেসমন্ড অঝোরে কাঁদতে লাগলো ।

বেশিক্ষণ ঘরে থাকতে পারলো না ডেসমন্ড বুড়ো।বাইরের কোলাহল আরো কাছে মনে হলো। তাকিয়ে দেখলো নেকড়ের দল পাঁচিলের ধারে পড়ে থাকা কবরের কাঠগুলো নিয়ে ছুটোছুটি করে কি যেন বানাচ্ছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ডেসমন্ড। সহসা ওর বুকের ভেতরটা কে যেন অদৃশ্য মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিলো।একি করছে ওরা? ডেসমন্ড দেখলো অল্প সময়ের মধ্যে শয়তানের দল তিনটি ক্রুস বানিয়ে উঁচু ঢিবিটার ওপর পুঁতে দিয়েছে। আর তিনজন দেবদূত–হায় ঈশ্বর–ছুটে যেতে গিয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো ডেসমন্ড।

তিনজন দেবদূত এতটুকু শব্দ করেনি। ওদের মুখে শুধু যন্ত্রণার নীল ছায়া গাঢ় হলো। ডেসমন্ড মাটি থেকে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো।আকাশের ঘন কালো মেঘের গায়ে তিনটি বিশাল ক্রুস।গির্জার প্রাঙ্গণে যীশুখৃস্টের ক্রুসবিদ্ধ মূর্তি দেখেই শয়তানের দল এই নির্মম মৃত্যুর কথা ভেবেছিলো।

তিনজন মুক্তিযোদ্ধা, যারা গতরাতেও শত্রুর শিবিরে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, সকালে তারা তিনজন যীশুখৃস্ট হয়ে গেছে।

ডেসমন্ড মেঘের গায়ে কুসবিদ্ধ যীশুকে দেখতে পেলো।ঠিক এই রকম ক্রুসের উপর থেকেই তিনি বলেছিলেন, এলী এলী লামা শবানী।ঈশ্বর আমার ঈশ্বর ...”।

নেকড়ের দল হল্লা করে বেরিয়ে গেলো। ডেসমন্ড দেখলো কি যেন বিড় বিড় করে বলছে ওরা। হাত থেকে রক্ত ঝরছে। সারা শরীর বেয়ে রক্তের ধারা নেমে এসেছে। সবুজ ঘাসের আঙিনায় লাল রক্ত জমছে। ওদের মাথা একপাশে কাত হয়ে ঝুলে পড়েছে। ডেসমন্ড ছুটে গেলে ক্রুসের নিচে। আবার মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। তবু সে শুনতে পেলো।একবার, দুবার তিনবার।পরপর তিনবার শুনলো সেই কথা।ডেসমন্ডের বুকের ভেতর গেঁথে গেলো–স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা।আর ঠিক সেই সময় আকাশ আর মাটি কাঁপিয়ে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়লো।

তিনদিন পর বুড়ো ডেসমন্ড ঘরে বসে গুণ গুণ করে বাইবেল থেকে যীশুর পুনরুত্থানের অধ্যায় পড়ছিলো।দরজায় পায়ের শব্দ শুনে চমকে তাকালো।দেখলো তিনজন দেবদূত। হাসি মুখ, উজ্জ্বল চোখ, মুক্তোর মত ঘাম।আগের মতো তিনজন মুক্তিযোদ্ধা।

বোবা মেয়েটার মুখে হাসি ফুটলো।

ডেসমন্ডের চোখের সামনে তখন মথি লিখিত সুসমাচারের শেষ কথাটা নেচে বেড়াতে লাগলো–আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে আছি।” শব্দগুলো ধীরে ধীরে লক্ষ লক্ষ সবিদ্ধ যীশুখৃস্ট হয়ে গেলো।

ওদের একজন একটু হেসে বললো, আমরা এসেছি। বুড়ো ডেসমন্ড কয়েক লক্ষ যীশুখৃস্ট দেখতে দেখতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো।

জয় পরাজয়

যারা পুরোনো ঢাকায় থাকো, তারা হয়তো ব্রাদার পলকে দেখে থাকবে। মোটা সোটা হাসিখুশি মানুষটি। ঘামে আর রোদের আঁচে টক টকে চেহারাটা যেন ভাজা চিংড়ির মত ঝলসে গেছে। থুতনিতে সুন্দর করে ছাঁটা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মুখে মোটা একটা হাভানা চুরুট, সাইকেলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পথে পরিচিত কাউকে দেখলেই সাইকেলে বসে হাত তোলেন। চেঁচিয়ে বলেন, 'গুড মর্নিং' নয়তো 'গুড আফটারনুন!' তারপর–হাউ ডু য়্যু ডু?

সেদিন আমি এই ব্রাদার পলের কাছেই একটা মিথ্যে কথা বলেছিলাম। ব্রাদার সেদিন সেই মিথ্যাটাকেই সত্যি বলে বিশ্বাস করেছিলেন। তাই আমার হয়ে ব্রাদার ডিক সম্পর্কে কড়া মন্তব্য করে মিশনে চিঠি লিখেছিলেন। যার জন্য স্কুলের নতুন টিচার সেদিন বাধ্য হয়েছিলেন স্কুল ছাড়তে।

সেই দিনটার কথা এখনো পষ্ট আমার চোখের সামনে ভাসছে। ক্লাশ টেনে পড়ি তখন। অর্থাৎ রীতিমত কর্তা গোছের। ক্লাশ ছুটি। আমরা সবাই তবু ক্লাশে বসে জটলা করছি। আলোচনাটা ব্রাদার ডিককে নিয়ে। সালেহ্, ফারুক, মাসুক ওরা সবাই বলছিলো ব্রাদারকে একটা ভালো মত শিক্ষা দেয়া দরকার। সালেহটা এর মধ্যেই গায়ে গতরে দিব্যি পাণ্ডা গোছের হয়েছে। গলা শোনা যাচ্ছে বেশি ফারুকের। ব্রাদার নাকি বলেছেন, বাংলা চামারের ভাষা। আমার সাথে কেউ বাংলা বলতে পারবে না। ইংরেজিতে কথা বলবে' (ব্রাদার অবশ্য এসব ইংরেজিতেই বলেছেন)। আর ক্লাশ সিক্সের একটা ছেলেকে নাকি লাথি মেরে সিঁড়ি থেকে নিচে ফেলে দিয়েছেন। কারণ ছেলেটা নাকি এর প্রতিবাদ করেছিলো।

ওদের আলোচনা দিব্যি গরম হয়ে উঠেছে। আমি মাঝে মাঝে শুনছিলাম, আবার মাঝে মাঝে নিজেদের আলাপে ফিরে যাচ্ছিলাম। আনোয়ার আর ইউসুফ বসে সামনে টেষ্ট পরীক্ষার বিষয়ে আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। গরম বেশি ফারুকদের আলোচনা। মাঝে মাঝে টেবিলে চড়-ঘুষির শব্দও পাওয়া যাচ্ছে। হাতে চক পেয়ে জহির আর আনসারী বিজি আচারিয়া স্যারকে নকল করে বোর্ডে জ্যামিতির আঁক কষছে। এমন সময় সুয়িং ডোর-এর উপর দিয়ে তাকালেন ব্রাদার ডিক।

নতুন এসেছেন ব্রাদার আমেরিকা থেকে। অল্প বয়স, সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, খাঁটি 'ম্যারিকান' চেহারা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলেন ক্লাশের ভিতরের দিকে, যেখানে আমরা কেউ টেবিলে, কেউ চেয়ারে, কেউ বেঞ্চে হাত-পা মেলে বসে।

আনসারীই ব্রাদারকে প্রথম দেখেছে। আমাদের হুঁশিয়ার করে দেয়ার জন্যে হাতের ডাস্টারটা ছুঁড়ে মারল কোণার দিকে। তোবারক ভাবলো ওকেই বুঝি ছুঁড়ে মারা হয়েছে। সেও পাল্টা ছুঁড়তে যাবে–তক্ষুণি বুঝি বাজ পড়লো ক্লাশের মধ্যে। ব্রাদার ডিক গর্জে উঠলেন–গেট আউট। অল অব ইউ গেট আউট!

সারা ক্লাশ তখন ঘোষাল স্যারের ভাষায় 'পিন ড্রপ সাইলেন্ট'।একে একে সবাই সুড় সুড় করে উল্টো দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগলো।আমারই মাথায় বোধ হয় শনি ভর করে ছিলো।বুঝতে পারছিলাম না ব্রাদারের এত রাগের কারণ কি ঘটেছে। ব্রাদার আবার চিৎকার করে উঠলেন –গেট আউট অব দা ক্লাস!

আমার বিস্ময়টা বেড়েই চলেছে।ক্লাশে তাকিয়ে দেখি সবাই বেরিয়ে গেছে।আমাকেই কি তাহলে ব্রাদার যেতে বলছেন? ব্যাপারটা কী? স্যান্ডেল খুঁজে পরতে একটু দেরিই হয়ে গেলো।ঝড়ের বেগে ব্রাদার ক্লাশে ঢুকলেন।চেঁচিয়ে বললেন, ডি'ন্ট ইউ হিয়ার মি সোয়াইন?

এবার মাথা তুলে তাকালাম।বিস্ময় আর রাগ দু'টোই মিশে আমাকে মুহূর্তের জন্য ভুলিয়ে দিলো আমি যে তখনো ক্লাশেই আছি।ব্রাদারের চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, হাউ সিলি! হোয়াই মেক্স ইউ অ্যাঙগ্রি!

হোয়াট!

আবার যেন ক্লাশে বাজ পড়লো।

ইউ-ইউ–

রাগের মাথায় কথা হারিয়ে ফেললেন ব্রাদার ডিক।ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে আমাকে ছুঁড়ে দিলেন হল রুমের দিকে।

ছেলেরা সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে।রাগে আমি প্রায় জ্ঞান হারিয়ে বললাম, ইডিয়ট! হাউ ডেয়ার ইউ কল মি সোয়াইন?

এবার বাজ নয়, পাঁচশো পাউন্ডের একটা বোমা যেন ফাটলো হল রুম-এর ভেতর– হোয়াট!

মনে হল পুরো বাড়িটাই বুঝি ব্রাদারের চিৎকারে থর থর করে কেঁপে উঠেছে।

ইউ কল মি ইডিয়ট? এবারে ঘাড় ধরে আর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন না।প্রায় শূন্যের মাঝে ঝুলিয়ে নিয়ে এলেন টিচার্স রুমের ভেতর দিয়ে একেবারে হেড মাস্টারের অফিস রুমে।

ছুটি হয়ে গেলেও প্রায় টিচারই যান নি, টিচার্স রুমে বসে গল্প করছিলেন।সবাই ছুটে এলেন।গোমেজ স্যারের বিস্ময়টাই সবচেয়ে বেশি।বললেন, কী হয়েছে শাহরিয়ার?

বললাম, ব্রাদার আমাকে অপমান করেছেন।

স্যার আর কথা বাড়ালেন না। ব্রাদারের সাথে যখন গণ্ডগোল তখন কেউ আর সহানুভূতিও দেখালেন না।

ব্রাদার ডিক আমাকে বসিয়ে রেখে বললেন, স্ট্যান্ড হিয়ার, ডোন্ট মুভ!

ক্লাশের অন্যান্য ছেলেদের কাছে ব্যাপারটা ধারণার বাইরে। ক্লাশের সবচেয়ে শান্ত ছেলেটাকে এভাবে রাগতে দেখে তারাও কেউ কাছে আসতে সাহস করলো না।

আধ ঘন্টার মত কেটে গেলো। ভাবছিলাম হেড মাস্টারকে নিয়ে বুঝি ব্রাদার ডিক আসছেন। কিন্তু কারো দেখা নেই। হেড মাস্টারের রুমের সামনে দাঁড়িয়ে রাগে আমার হাড়পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিলো। শেষে আমাদের দপ্তরি ধনাইকে দিয়ে খবর পাঠালাম, হেডমাস্টার অর্থাৎ ব্রাদার ম্যাকডোনাল্ড যেন এক্ষুণি একবার আসেন।

ব্রাদার ম্যাক এলেন। অফিস খুলে ভেতরে গিয়ে বসলেন। বললেন, কি হইয়াছে। শ্যরিয়র?

বললাম, ব্রাদার ডিক আমাকে মিছেমিছি ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ক্লাশ থেকে বের করেছেন। আর টিচারদের সামনে আমাকে অপমান করেছেন।

ব্রাদার ম্যাক বিস্মিত হয়ে বললেন, হোয়াই? কেন?

আমি জানি না কেন। তবে ব্রাদার, আমি এর কারণ জানতে চাই, কেন ব্রাদার ডিক আমার গায়ে হাত দিলেন। কেন টিচারদের সামনে ঘাড় ধরলেন, কেন তিনি সোয়াইন বললেন? কালই আমি এর জবাব চাই।

এতগুলো কথা বলে আমি উত্তেজনায় কাঁপছিলাম।ব্রাদার ম্যাক সান্ত্বনার স্বরে বললেন, বি ইজি মাই বয়।গো হোম অ্যাণ্ড সি মি টুমরো।

ব্রাদারের অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। ছেলেরা সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করলো, কী বললেন ব্রাদার?

বললাম সব। ফারুক এবার আস্তে আস্তে বললো, ব্রাদার যদি কিছু না করেন তাহলে তুই কী করবি?

শান্ত ভাবেই ওকে বললাম তাহলে ইশকুল ছেড়ে দেবো।

এ কেমনতরো পাগলামি।সবাই গুঞ্জন করে উঠলো, ইশকুল কেন ছাড়বি?

এ ছাড়া অন্য কোনো পথ আমি দেখছি না।

ওরা সমস্বরে প্রতিবাদ জানালো।বললো, প্রতিবাদ তুই একা কেন করবি? আমরা সবাই একসঙ্গে করবো।

কি ভাবে? আমি অবাক হই একটু।

আমরা কাল থেকে ক্লাশ কোরবো না।

তা কী করে হয়! মনে মনে খুশি হলেও বাইরে আপত্তি জানাই, টেস্ট সামনে, আমার একার জন্যে কেন তোরা সবাই ভুগবি?

ফারুক বললো না, ডিকের সাথে একবার বোঝাঁপড়া হওয়া উচিৎ। ও কেবলই বেড়ে যাচ্ছে। ভুলে যাস কেন ও বাংলাকে কি বলেছে? ক্লাশ সিক্স-এর ছেলেটাকে ও লাথি মেরে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিয়েছে। এর প্রতিবাদ জানানোর এমন সুযোগ আর আসবে না।

ঠিক হল কাল থেকে টেন-এর ছাত্ররা ক্লাশ করবে না।

পরদিন সবাই এলো ইশকুলে। ঘন্টাও বাজলো। কিন্তু টেন-এর ছাত্ররা মাঠে দাঁড়িয়ে রইলো।

আমাদের মিশনারি ইশকুলের কড়া ডিসিপ্লিনের ভেতর এ ধরনের নিয়মভঙ্গ স্কুল-জন্মের গত আশি বছরে কেউ কোনো দিন দেখে নি।ক্লাশ শুরু হ'লকিন্তু আমরা ক্রিকেট খেলার মাঠেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

খবর পেয়ে ছুটে এলেন ব্রাদার ম্যাক।বললেন তোমরা কি কেউ ক্লাশে যাইবে না?

মৃদু গুঞ্জন উঠলো।সবাই বললো না।

অপমানে ব্রাদার ম্যাকের টকটকে মুখ থেকে বুঝি রক্ত ছিটকে বেরিয়ে আসবে। ঠাণ্ডা গলাতেই বললেন, শ্যরিয়র! হোয়াট অ্যাবউট ইউ?

আমি চুপ করে রইলাম। ব্রাদার ম্যাক বললেন, ইজ ইট টু শ্যরিয়র? তুমি ব্রাদারকে ইডিয়ট বলিয়াছ? ইজ ইট টু?

ওরা সবাই এক সঙ্গে বললো, মিথ্যে কথা, ও কখনো বলেনি!

ব্রাদার ম্যাকের গলা একধাপ উপরে উঠলো—ইউ বয়েজ! বি কোয়াইট! আই অ্যাম নট আস্কিং ইউ? শ্যরিয়র? (গলা নামিয়ে) ইজ ইট টু?

একবার ওদের সবার মুখের দিকে চাইলাম।মাথা নিচু করে বললাম, নো।

নো! ব্রাদার একটা ধাক্কা খেলেন যেন। পরে বিড়বিড় করে বললেন, হি শুডন্ট টেল এ লাই!

তারপর ব্রাদার আস্তে করে বললেন, ওয়েল বয়েজ।এখন তোমরা কী চাও?

ফারুক গলা তুলে বললো, ব্রাদার ডিককে ক্ষমা চাইতে হবে।

আবার এক ঝলক রক্ত উঠে এলো ব্রাদার ম্যাকের মুখে। বললেন, ক্ষমা! ইউ মিন এ্যপোলজি? হাউ ক্যান ইট বি পসি?

অন্যায়টা ব্রাদারের। ওর গায়ে তিনি হাত তুলেছেন। ক্ষমা তাঁকে চাইতেই হবে। এবার সালেহ গলায় জোর দিয়ে বললো ।

ব্রাদার ম্যাক অবাক হয়ে গেলেন ছেলেদের এ ধরনের দুঃসাহস দেখে।আপোষের।সুরে বললেন, লুক বয়েজ! তিনি তোমাদের শিক্ষক। তিনি কি করিয়া ক্ষমা চাইবেন তোমাদের নিকট?

ফারুক বললো, তিনি অন্যায় করেছেন।

মাঠ দিয়ে এমন সময় ছুটে এলেন ব্রাদার ডিক।হাতে একগাদা ডিটেন স্লিপ।আমাকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ইট ইজ ইউ, সোয়াইন! ইউ শুড লিভ দ্য স্কুল অ্যাটওয়ান্স!

ডিটেন স্লিপগুলো এগিয়ে দিলেন—মাস্ট সি মি আফটার স্কুল।

হাত বাড়িয়ে স্লিপগুলো নিলাম। ওদের দিকে আর একবার তাকালাম। তারপর টুকরো টুকরো করে স্লিপগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

ব্রাদার ম্যাক কথা বলার সময়ও পেলেন না। স্লিপগুলো ছিঁড়তেই ঠাণ্ডা কঠিন গলায় শুধু বললেন, ব্রাদার ডিক!

ওই বলটুকুই যথেষ্ট ছিলো। ব্রাদার ডিক গটগট করে চলে গেলেন মাঠের ঘাস মাড়িয়ে। এবার ম্যাক আমাদের বললেন, আমি আমার স্কুলে কোনো গণ্ডগোল হইতে দিব না। ক্লাশ না করিলে তোমরা স্কুল কম্পাউন্ডে থাকিতে পারিবে না। তোমরা ক্লাশে যাও, নচেৎ বাহিরে যাও।

পায়ে পায়ে সবাই স্কুল থেকে বেরিয়ে এলাম। এবার? সবার মুখে এক প্রশ্ন, এবার আমরা কী করবো? আমি বললাম, খবরের কাগজে গিয়ে জানিয়ে আসি। তারাই বলে দেবেন কী করতে হবে।

ওরা প্রায় সবাই বললো, তাতে লাভ হবে না, তাঁরা ক্লাশেই ফিরে যেতে বলবেন।

ফারুক পাশের কলেজের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, চল ঐ কলেজের ছাত্রদের জানাইগে। ওখানে আমাদের স্কুলের পুরানো ছাত্র অনেকে পড়েন। তারাই যা করার করবেন।

ওর কথা সবাই মেনে নিলো। পাশের কলেজে গিয়ে ওখানকার আলী ভাইকে সব বললাম। আলী ভাই তখন সেখানকার ছাত্র নেতা। বাংলা ভাষা সম্পর্কে অমন বলেছেন শুনে তিনি ক্ষেপে গেলেন। এক গাদা ছেলেকে ডেকে বললেন, চল আমরা এক্ষণি গিয়ে দেখি।

ওরাই আগে আগে ঢুকলেন ইশকুলে। ছুটে এলেন ব্রাদার ম্যাক। এটা বোধহয় তার ধারণার বাইরে ছিলো। বললেন, হোয়া রং? হু আর ইউ? হোয়াই ইউ আর হিয়ার?

প্রথমেই ব্রাদার যে জবাবটা পেলেন, সেটা আলী ভাইয়ের গলায় বাংলায় কথা বলুন।

ব্রাদার একটু থমকে গেলেন। একটু হেসে বললেন, ও-কে। আমি ভালো বাংলা জানি না। তোমরা এইখানে কেন আসিয়াছ?

আলী ভাই আমাকে দেখিয়ে বললেন, এই ছেলেকে ব্রাদার ডিক অপমান করেছেন। তিনি বাংলা ভাষাকে গালি দিয়েছেন। এর কারণ জানতে চাই।

ব্রাদার ম্যাক একবার আমার দিকে চাইলেন। মাথা নিচু করে রইলাম। ব্রাদার বললেন, এখন তোমরা কী চাও?

আলী ভাই বললেন সেই একই কথা—সে জন্যে তাঁকে মাপ চাইতে হবে।

ইতিমধ্যে আমাদের টিচাররা দেখি সবাই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। উপরে তাকিয়ে দেখি দোতালার ছাদে ব্রাদার ডিক।

গোমেজ স্যার আমাকে ডেকে বারবার অসহিষ্ণু গলায় বললেন, এ কী করে হয় শাহরিয়ার? তোমাকে আমরা অনেক ভালো বলেই জানি। তুমি এ কী করছো? ব্রাদার কী করে তোমার কাছে ক্ষমা চাইবেন? এ কেমন করে হয়?

চাইতেই হবে! আলী ভাই আমার কানের কাছে গর্জে উঠলেন—তার উচিৎ প্রত্যেকটা বাঙালীর কাছে গিয়ে মাপ চাওয়া। তার কোনো অধিকার নেই, আমাদের ভাষাকে অপমান করার।

সবার গলাতেই প্রতিধ্বনিত হ'ল আলী ভাইয়ের কথাগুলো। সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।খারাপ লাগছে আমার।রাগে অপমানে লাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ব্রাদার ম্যাক। গোমেজ স্যার ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। মনে হলো একবার বলি, আলী ভাই আপনারা ফিরে যান। আমি তাকে ক্ষমা করেছি। তাছাড়া আমিতো ব্রাদার ডিককে ইডিয়ট বলেছিলাম। তার জন্যে ব্রাদার ম্যাকের কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছি না।পরে ভাবলাম, এখন একথা বললে সবার হাসির পাত্র হবো।

ওরা সবাই গরম হতে লাগলো। আলী ভাই বললেন, কই, তিনি কই? তাঁকে ডেকে আনুন।

ব্রাদার ধনাইকে ইশারা করলেন। বুড়ো ধনাই ছুটলো ব্রাদার ডিককে ডাকতে। ব্রাদার ম্যাক বললেন, শ্যরিয়র! তুমি ব্রাদারকে ইডিয়ট বল নাই?

ছেলেরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো, না।

ব্রাদার বললেন, ব্রাদাররা কখনো মিথ্যে বলেন না।

আমি চুপ করে রইলাম। ভিড়ের ভেতরে থেকে কলেজের ছাত্রদের একজন বললো, আহা আমার যুধিষ্ঠির রে!

ব্রাদার ম্যাকের মুখ আর একপশলা লাল হলো।ব্রাদার ডিক এলেন।আর এলেন ব্রাদার পল।কোথাও গিয়েছিলেন বোধহয় ব্রাদার পল।কাছে এসে কাঁধে হাত রাখলেন।আমার দিকে একবার চাইলেন। তাঁর সাগর নীল চোখ দুটোয় কোনো রাগ নেই, কোনো তিরস্কার নেই। শুধু সামান্য অভিযোগ—আমি তোমার কাছে ইহা আশা করি নাই শ্যরিয়র।

ইচ্ছা হল মাটিতে মিশে যাই।ব্রাদার পলও একথা বললেন! চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। ব্রাদার পল আবার বললেন, ব্রাদার ডিকের ক্ষমা চাইবার আগে তোমার ক্ষমা করা উচিত সিল শ্যরিয়র।

এবার আমি আস্তে করে বললাম, আমার আর কোনো অভিযোগ নেই ব্রাদার পল।

ব্রাদার পল আরো আস্তে বললেন, ইহাদের কেন আনিয়াছ?

আলী ভাই ব্রাদার ডিককে বললেন, আপনি কেন বাংলা ভাষাকে চামারের ভাষা বললেন? কেন এ ছেলেকে অপমান করে কথা বলেছেন।এর কারণ জানতে চাই।

লাল হয়ে গেলেন ব্রাদার ডিক।বললেন, আই ডিডিন্ট সে সো।

আবার আলী ভাই গর্জে উঠলেন, চুপ, বাংলায় বলুন।আপনি বলেছেন।আর সে জন্যে আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে!

নো! আই ডোন্ট–

শাট, আপ! ব্রাদার ডিককে বাধা দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন আলী ভাই ক্ষমা না চাইলে আপনি ধারণাও করতে পারবেন না আপনার কি হবে!

ব্রাদার পল শান্ত স্বরে বললেন, বি ইজি মাই চাইল্ড। অপমান বলিতে তোমরা কী বুঝিয়াছ? অপমান কোনো দিন উপর হইতে আসে না, তোমাদের পিতা তোমাদের অপমান করিতে পারে না।তোমরা তোমাদের পিতাকে অপমান করিতে পারো।ব্রাদার ডিক তোমাদের পিতৃস্থানীয়।তাঁহাকে তোমরা অপমান করিও না।

আপনি কে? বাধা দিয়ে আলী ভাই বললেন–ও সব আমরা শুনতে চাই না।ওসব কথা ক্লাসে বলবেন।এখন একে ক্ষমা চাইতেই হবে।

ব্রাদার পল একটু থেমে বললেন, আমিও তোমাদের পিতার মতো। ওয়েল বয়েজ! তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।ব্রাদার ডিক!

ব্রাদার ডিক তাকালেন।ব্রাদার পল বললেন ব্রাদার ডিক।ইউ শুড-।

ব্রাদার ডিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।ব্রাদার পল এবার একটু কঠিন গলায় বললেন, ব্রাদার ডিক!

ব্রাদার.ডিক রাগ চেপে আলী ভাইকে বললেন, আমি কী বলিব?

আলী ভাই বললেন, বলুন, আমি যা বলেছি তার জন্যে আমি লজ্জিত, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

থেমে থেমে ভাঙা বাংলায় ব্রাদার ডিক বললেন, আমি যদি তোমাকে অপমান করিয়া থাকি তবে সে জন্য আমি লজ্জিত।

আলী ভাই শক্ত গলায় বললেন, ও ভাবে নয়।যদি কোনো কথা নয়, আপনি সোজা ক্ষমা চান!

গোমেজ স্যার অসহিষ্ণু গলায় বললেন, শাহরিয়ার কিছু বল? তুমি চুপ করে আছো কেন?

ব্রাদার ডিক তাকালেন আমার দিকে।সাপের মত ঠাণ্ডা চাহুনি।বললেন, আমাকে ক্ষমা কর।

আলী ভাই বললেন, ঠিক আছে।আপনি যান।আর হেড মাস্টার স্যার, এ নিয়ে যদি কোনো শাস্তি এই ছেলেকে দেয়া হয় তাহলে এর ফল ভালো হবে না।

আলী ভাইরা চলে গেলেন।ব্রাদার ম্যাক বললেন তোমরা আজ বাড়ি যাও।কাল হইতে ক্লাশে আসিবে।

ওরা চলে গেল।ব্রাদার পল বললেন, শ্যরিয়র, আমার সঙ্গে আস।উপরে নিয়ে গেলেন আমাকে ব্রাদার পল।একেবারে তার ঘরে।বললেন বস।

বসলাম।অনেকক্ষণ পর বললেন, ব্রাদার ডিককে তোমার জন্য স্কুল ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

ঢোক গিলে কোনো রকমে বললাম, কেন?

ব্রাদার পল বললেন, তোমার কথা যদি সইত্য হয়, তাহা হইলে ব্রাদার ডিক মিথ্যা কথা বলিয়াছেন।

জবাব দিলাম না, মাথা নিচু করে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ চুপ থেকে ব্রাদার পল বললেন, ব্রাদাররা মিথ্যা বলেন না।

গির্জার ঘড়িতে বারোটার ঘন্টা বাজলো। ব্রাদার কিছুক্ষণ নিরব থেকে ঘন্টাগুলো গুনলেন।বললেন, তুমি অন্যায়কে সইয্য কর নাই।এই জিনিসটা আমি সারা জীবন তোমার মইধ্যে যেন দেখি।

ব্রাদার আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। শেষে আস্তে আস্তে বললেন, তুমি মনে রাখিও বাংলার অপমান তুমি আইজ সইয্য করিতে পার নাই।ভবিষ্যতে কোনোদিন যেন তোমার সামনে বাংলাকে কেহ অপমান করিতে না পারে।বাড়ি যাও।মে গড ব্রেস ইউ! এই বলে ব্রাদার পল বুকে ক্রুস আঁকলেন।

ইশকুলে গেটের বাইরে ছেলেরা তখন যুদ্ধ জয়ের আনন্দে মেতে আছে। আমি দোতালার জানালা দিয়ে একবার দেখলাম।মনে হলো এ জয় আমার নয়।নিচে নামতে ওরা সবাই আমাকে লুফে নিলো।বললো, আমাদের হিরো।

আমি হাসতে চাইলাম।পারলাম না।আমার দুটো চোখ তখন কান্নায় ভরে গেছে।

দেয়াল

তানাকে মা ভীষণ বকলেন।তোমাকে একশো দিন বারণ করেছি, ওভাবে ফ্রিজ খুলে রেখো না।আমার কথা কি তোমার কানে যায় না? কেন খুলেছিলে?

তানা কোন কথা বললো না।মা আবার বললেন–আর কোনোদিন যেন না দেখি।মনে রেখো।

তানা চলে এলো মার সামনে থেকে।অনেক কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিলো।ও বলতে চেয়েছিলো! মা, আমি বহুদিন হিমালয় দেখিনি, তুষারের কাছে যাই নি, তোমাদের ফ্রিজে তারই ছায়া দেখছিলাম।আরো অনেক কথা বলতে চেয়েছিলো তানা।সকল কথা গলার কাছে কাটা মুরগির মতো ছটফট করছে শুধু।সবাইকে সব কথা বলা যায় না।

মা তানাকে বকে বকে শেষটায় মেজদাকে গিয়ে বললেন–তোমার আদরের তানার কাণ্ড শোন জাফর।আমি গিয়ে দেখি হাট করে ফ্রিজ খুলে তিনি দাঁড়িয়ে ধ্যান করছেন।দিন দিন ও যে সব কাণ্ড করছে তাতে কোনো দিন যে কি অঘটন ঘটিয়ে বসে ঠিক নেই।

তুমি বাপু ওকে ফেরত দিয়ে এসো গে তোমার সেই বন্ধুর কাছে।

মেজদা চোখে পুরু কাঁচের চশমা ঝুলিয়ে বই পড়ছিলেন।মার দিকে না তাকিয়েই বললেন–ওতো সিসিলি চলে গেছে মা।সেখান থেকে হয়তো মাদ্রিদ যাবে।

মা রেগে গজ গজ করেন–যেমন চাকর এক পাগল, তেমনি মনিব আরেক পাগল। সেদিন না এলো সবে যা না কোত্থেকে?

মেজদার কপাল একটু কুঁচকে গেলো।চশমাটা খুলে বললেন, তানাকে ওভাবে চাকর বোলো না মা।শুনলে ওর মন খারাপ করবে।তোমাকে তো বলেছি মা, ও একটু অন্যরকম পরিবেশে মানুষ।

মা ভেবে পান না চাকরকে চাকর বললে মন খারাপ করবে কেন।আর চাকরকে এতো মাথায় তোলাইবা কেন।তিনি এসব পছন্দ করেন না।

তানাকে দিয়েছিলেন মেজদার এক বন্ধু।অনেকদিন তার সঙ্গে থেকেছিলো তানা।শুধু ঘুরেছে।হিমালয়কে দেখেছে আকাশের গা ছুঁতে।তেমনি সমুদ্রকেও দেখেছে আকাশের সাথে মিতালি পাতাতে।আকাশ দেখতে ভালো লাগে তানার।আরো ভালো লাগে যখন দেখে হিমালয় আর সমুদ্রকে আকাশের সাথে মিশে যেতে।বাগানে শুয়ে শুয়ে তানা আকাশের নীল দেয়াল দেখে।ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।সেই নীলে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

মা ডেকে বিরক্ত হয়ে যান–কোথায় থাকো তুমি?

তানা কোনো কথা বলে না।

মা রেগে বলেন, যাও ড্রইং রুমটা মুছে ফেলো।আবার যেন একবারের বেশি ডাকতে না হয়।

তানার এ বাড়িটা ভালো লাগে না, সবাই চায় ও চার দেয়ালের ভেতরে আটকে থাকুক। কেউ ওর বাইরে ঘোরা পছন্দ করে না।সবাই এক একটা দেয়ালের মতো ওকে ঘিরে রাখতে চায়।শুধু ভালো লাগে মেজদাকে।

মন খারাপ হলে তানা মেজদার কাছে আসে।মেজদা বুঝতে পারেন।বলেন, আমাদের চার পাশে অনেক দেয়াল তানা!

তানা বলে, আমি দেয়ালের ভেতর চাপা পড়ে মরে যাচ্ছি মেজদা।আমাকে বলুন আমি কী করবো।

মেজদার মনে হয় তানা ওর আঠারো বছর সময়ের বয়সের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে।বলেন, তুমি কি করবে না, সেটা সময় হলে নিজেই বুঝবে।কেউ বলে দিতে পারে না।আমি শুধু এটুকু বলতে পারি নিজেকে কখনো ছোট ভেবো না।

রান্না ঘরে অবুর মাকে তানা প্রশ্ন করে, আচ্ছা অবুর মা, আমাদের চারপাশে এতো দেয়াল কেন?

অবুর মা ভুরু কুঁচকে বলে, কী কইলি?

চারপাশে এতো দেয়াল কেন?

অবুর মা বড়ো বড়ো চোখে বলে, দ্যাল ক্যানে থাকপে নাই বাপ? দ্যাল না থাকলে মোরা থাকপো কনে?

তানা বিড়বিড় করে বলে, আমরা আকাশের নিচে থাকবো।

অবুর মা বলে, তোর মাতাডা খারাপ হইয়ে গ্যাছে বাপ।কী যে কস উয়ার কুনো দিশ নাই!

মা শুধু তানার স্পর্ধা দেখে অবাক হন। তোকে না একশো দিন বারণ করেছি অ্যাকুরিয়ামের কাঁচ সরাবি না? কেন ওখানে হাত দিয়েছিলি?

তানা কোন কথা বলে না।মা আরো রেগে যান বল, কেন হাত দিয়েছিলি?

তানা কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, এমনি দেখছিলাম।

আর যেন কখনো মাছের অ্যাকুরিয়ামের কাছে তোকে না দেখি।

ছোড়দা বলেছিলো ওগুলো নাকি সমুদ্রের মাছ।তানা সেখানে সমুদ্রের ছায়া খুঁজছিলো। ভেবে পায় না সমুদ্রের মাছ এতো ছোট জায়গায় বাঁচে কি করে।

তানা অবুর মাকে বলে, আচ্ছা অবুর মা, মাছগুলো ওভাবে আটকে রেখেছে কেন?

অবুর মা অবাক হয়–আইটকে রাখার জন্যিইতো ওগুলি এনেছে।

কেন আটকে রাখবে তাই বলো না?

সোন্দর লাগে বইলে আইটকে রেখেছে।

কোথায় সুন্দর অবুর মা! আমার ভারি বিচ্ছিরি লাগে ওদের এভাবে আটকে থাকাটা।

কী জানি বাপ, বড়লোকের খ্যাল।আমরা ছোডলোকেরা তা কবো ক্যামনে।

কে বললে অবুর মা আমরা ছোট লোক?

তাই তো জেনে এইছিরে বাপ!

কে জানালো তাই বলো না?

কারু জানাতি হয় নারে বাপ।দেখতি দেখতি জানা হয়ি যায়।

কেন জানবে তুমি ছোট লোক? জানো অবুর মা, মেজদা সেদিন পড়ছিলো, মানুষ–যার নামের শব্দ এতো গরীয়ান–আর তুমি তাকে বলবে ছোট লোক? বলতে বলতে তানা উদাস হলে যায়।

অবুর মা তানার দিকে পিট পিট করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, তোর চুলগুলো কেইটে ফেলিস।চুল এতো লম্বা রাখলি পরে মাথার মগজ চুইষে খায়।তুই পাগল হয়ে যাবি বাপ।

একদিন তানা বইয়ের আলমারি খুলে একটা বই বের করেছিলো।মা সেটা দেখতে পেয়ে তক্ষুণি একটা তালা ঝুলিয়ে দিলেন।তালা বন্ধ আলমারির কাঁচের ভেতর দিয়ে বইগুলো দেখলো তানা।চমকে উঠলো, বইগুলো ছটফট করছে দেখে।শেষে দেখলো, বই নয় তার নিজের ছায়াটাই কাঁচের বন্ধ দরজায় ছটফট করছে।

মেজদা শুনে বললো, তুমি ঠিকই দেখেছো তানা।বইগুলোই ছটফট করেছিলো।ওদের কেউ তালাবন্ধ করে রাখতে পারে না।

মা ধাপে ধাপে বিরক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেলেন।একদিন ভীষণ চিৎকার করলেন–ড্রইংরুমের দেয়ালের রঙ তুলছিলে কেন অমন করে?

তানা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকলো।মা আরো রেগে গেলেন–আমার কথার জবাব দাও।কেন নখ দিয়ে খুঁটছিলে ডিস্টেম্পার?

তানা আস্তে আস্তে বললো, এমনি শুধু দেখছিলাম।

কী দেখছিলে?

নীল রঙটার নিচে কী রয়েছে।

ওখানে আবার কী থাকবে?

তাইতো দেখলাম।

কী দেখলে? কোনো রঙ নেই।

ভেতরটা ফ্যাকাশে।

মা শক্ত গলায় বললেন, তোমাকে আমি শেষ বারের মতো সাবধান করে দিচ্ছি।তানা!

তানা চোখ তুলে তাকালো।

কক্ষনো তুমি ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে পারবে না।

তানা চমকে উঠলো।

রান্না ঘরে অবুর মা ঝন ঝন করে কি যেন ভাঙলো।

মা সেদিকে কান না দিয়ে বলে চললেন–কক্ষনো তুমি জাফরের ঘরে যেতে পারবে, কক্ষনো তুমি ড্রইং রুমে যেতে পারবে না।সারাদিন রান্না ঘরে থাকবে।কাজ ছাড়া বসে থাকতে যেন না দেখি–

একের পর এক মা তার সাবধানের কথাগুলো বলে যাচ্ছেন।কিছু শুনলো তানা।কিছু শুনলো না।বাইরের আকাশটার দিকে তাকিয়ে থাকলো।দুপুরের আকাশটা একেবারে ফাঁকা।দূরে শুধু একটা চিল উড়ছে।বার বার ডাকছে ধারালো গলায়।কী যেন খুঁজছে ঘুরে ঘুরে।তানার মনে হলো চিলটা সারাদিন ধরে এমনিভাবে ঘুরছে।সারাদিন ঘুরবে। শুধু ঘুরবে।

সেদিন অনেক রাত অবধি তানা ঘাসের বাগানে ঘাসের বিছানায় একা শুয়েছিলো। আকাশে তারা জ্বলছিলো।তানা ছায়াপথ দেখলো।অসংখ্য তারার মিছিল চলেছে সে পথ বেয়ে।নিজেকে মিছিলের একজন ভাবলো।তারপর তানা এক অচেনা জগতে পৌঁছে গেলো, যেখানে আসবে বলে ভেবেছিলো বহুদিন ধরে।

আমি এখানে থাকলে মরে যাবো।ঘরে ফিরে ভাবলো তানা।বহুদিন আমি পাহাড় দেখিনি।সমুদ্র দেখিনি।আমি সমুদ্রের কাছে যাবো।পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে আকাশের কাছে যাবো।সেখানে ছায়াপথে তারার মিছিল।আমি মানুষের মিছিলে হারিয়ে যাবো।

তানার মনের ভেতর সহসা সেই মিছিলের আগুন জ্বলে উঠলো।ড্রইং রুমে ঢুকে অ্যাকুরিয়মটা দেখলো।হাতে তার একখানা ধারালো ছুরি।অ্যাকুরিয়ামের মাছগুলো একটা পাত্রে তুলে নিলো।ছুরির ঘায়ে অ্যাকুরিয়ামের কাঁচের দেয়ালটা ভেঙে গেলো। ঘরের রঙিন দেয়ালটা ছুরি দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিলো।তানার মনে হলো দেয়াল বেয়ে রক্ত ঝরছে।তার মুখটা তখন এক অদ্ভুত হাসিতে ভরে গেলো।

আকাশে যখন সূর্যের ছায়া পড়লো, তখন তানা সেই মাছগুলো আর ছুরিটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।ছায়াপথে অসংখ্য আলোর কনা।তানা সেই আলোর একজন।

পরদিন বাড়িতে দারুণ হৈ চৈ।শুধু মেজদা অবাক হলেন না।বিড় বিড় করে বললেন, তানা তাহলে সত্যিই চলে গেলো।

নতুন বছরের ছন্দ

তখন ওরা সবাই এক আনন্দের ঘরে বসত করছিলো। আলো ঝলমলে স্টেজে উঠে কেউ আবৃত্তি করছিলো। কেউ গান গাইছিলো। সবাই তালি দিচ্ছিলো। হাসি হাসি মুখে চুইংগাম আর চকোলেট চিবোচ্ছিলো।টেবিলে ফুলের ভেতর অনেক বই, লাল কাগজের মোড়কে লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা।ওদের প্রাইজ দেয়া হবে।

ছন্দ তখন এক কোণে দাঁড়িয়েছিলো। যেখানে ওদের আলো ওর গায়ে এসে লুটিয়ে হেসে ওঠেনি।আনন্দ সেখানে নরম কান্নার সানাইয়ের মতো বাজছিলো।ছন্দের বুকের ভেতর সেই কান্নাগুলো থরে থরে জমছিলো।

ইশকুলে নতুন বছরের উৎসব হচ্ছে।হোস্টেলের ছেলেরা সুপারের অনুমতি নিয়ে।রাত জাগা উৎসবের আয়োজন করেছে। রাত বারোটার পর ওরা আতশ জ্বালিয়ে নতুন বছরকে বরণ করবে। সারা রাত উৎসব করবে। সূর্য ওঠার পর প্রার্থনা সেরে ঘরে ফিরবে।

ছন্দ চেয়েছিলো সেই আনন্দের রাজ্যে ওকে নিয়ে যাক।কেউ ওকে ডাকেনি।

ছন্দের বাবা নেই।মা নেই।ওদের মিশনারি ইশকুলের ফাদার মার্টিন অনেক দিন আগে ওকে কোনো এক গ্রাম থেকে এনেছিলেন।সেই থেকে ছন্দ ইশকুলের হোস্টেলে থাকে। হোস্টেলের অন্য ছেলেদের মতো ওর কাছে কোনো ভিজিটর আসে না।ছন্দের সঙ্গে অন্য ছেলেরা মেশে না। উৎসবের দুই দিন আগে ভয়ে ভয়ে মনিটরকে বলেছিলো-''আমিও কবিতা আবৃত্তি করবো।

মনিটর তাকে ধমকে দিয়েছে–কী বললি আবৃত্তি? তুই কবিতা আবৃত্তি করবি? মুখ ফুটে কথা বেরোয় না, তুই আবৃত্তি করবি কবিতা? হেসে আর বাঁচিনে।

এরপর মনিটর সবাইকে ডেকে বললো, তোদের আর প্রাইজ পেতে হবে না।আমাদের ছন্দ এবার আবৃত্তি করবে।

তাহলেই হয়েছে! বলে সবার সে কি হাসি।ছন্দের মনে হলো যেদিন আশুতোষ স্যার ওকে বেত দিয়ে মেরেছিলেন, সেদিনও বুঝি সে এতো কষ্ট পায়নি।সে ছুটে গেলো। মনিটরকে গিয়ে এলোপাথাড়ি ঘুষি মারলো–কেন তোমরা আমাকে নিয়ে এভাবে হাসবে।আমার বুঝি কষ্ট হয় না? আমি তোমাদের কী করেছি?

ছেলেরা কেউ ওর কথা শুনলো না। সবাই ওকে খুব মারলো। ভীষণ নির্দয়ের মতো মারলো।শেষে ক্লান্ত হয়ে বললো, সুপারকে যদি কিছু বলেছিস তাহলে তক্তা বানিয়ে দেবো।

ছন্দ সুপারকে কিছু বলেনি।ওর জ্বর এসেছিলো।ও জানে হোস্টেল সুপার ভৌমিক স্যার খুব শান্ত মানুষ।ওদের ভয় পান।কিছু বললে তিনি কেমন যেন কুঁকড়ে যান–তোরা একটু মিলেমিশে থাকতে পারিসনে? নালিশ কেন করিস? যা বাপু মিটিয়ে ফেলগে।

ছন্দের সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় ওকে কেউ বুঝতে চায় না।ঘন্টাবুড়োকে বলে, আমি তো কাউকে খারাপ ভাবি না, ওকে কক্ষণো আমি মারতে চাইনি।কেন ওরা এমন করে?

বুড়ো জানে এমন অনেক প্রশ্নের যন্ত্রণা ছন্দের বুকটাকে কুঁরে কুঁরে ঝাঁঝরা করে দেয়।

তখন হু হু করে বাতাস বইছিলো। চাঁদটা পশ্চিমে হেলে পড়েছে। দুটো কাক ডানা ঝাঁপটে ডাকে।ভোর হতে বেশি দেরি নেই।

স্টেজের ওপর ওদের আনন্দ দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে ওঠে ছন্দ।

এক সময়ে ছন্দের মনে হলো কে যেন তাকে ডাকলো।শান্ত নরম গলায় ডাকলো, ছন্দ এসো।

বাগানে একরাশ ছুঁই ফুল ফুটে আছে।ওখানে ওকে ডাকলো, ছন্দ এসো।

ছন্দ অবাক হলো।ওরা বললো, আনন্দ এখানে।আমাদের ভেতরে।আনন্দ ভালবাসার ভেতরে।আনন্দ সুন্দরের ভেতরে।তুমি ওখানে কেন আনন্দকে খুঁজছো?

ছন্দ বললে, ভালোবাসা কোথায় পাবো? কেউ আমাকে ভালোবাসে না।

মিষ্টি হেসে জুই বললো সুন্দরের ভিতর ভালোবাসা।

সুন্দর কোথায়?

ভালোবাসার ভেতরে।

ছন্দ আবার বললো—ভালোবাসা কোথায়?

ওরা আবার বললো—সুন্দরের ভেতর।

বুঝিয়ে বলো।

জুঁই হাসলো—তোমার মনই হচ্ছে সব কিছু।বুঝলে ছন্দ, সুন্দর বলো, ভালোবাসা বলো সব কিছু রয়েছে তোমার মনে। ইশকুলের কুৎসিত চেহারার ঘন্টাবুড়োকেও তোমার ভালো লাগে। রামদয়াল মালির লোমওঠা থকথকে পোকাভরা কুকুরটাকেও তুমি ভালোবাসো, এই ভালোবাসাটাই সুন্দর। এই সুন্দরই ভালোবাসা। আর সব কিছু মিলিয়ে হলো ছন্দ।তুমি আমাদের ছন্দ।তুমি সকলের ছন্দ।তুমি সময়ের ছন্দ।তুমি এই নতুন বছরের ছন্দ।

ছন্দ তখন এক আনন্দের জগতে পৌঁছে গেলো।

ভোরের সূর্য ছন্দের কপালে চুমু খেলো।স্কুলে সবাই হৈ চৈ জুড়ে দিলো।ভৌমিক স্যার কাঁপতে কাঁপতে বললেন—ও বাগানে কখন এলো? ওর যে একশ চার ডিগ্রি জ্বর ছিলো! রাতে আমি ওকে শুইয়ে দিয়েছিলাম।

রামদয়ালের ঘেয়ো কুকুরটা কুঁই কুঁই করে কেবলই ঘুরতে লাগলো।ওরা ওকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলো।

ঘন্টাবুড়ো বিড় বিড় করে বললো–বাজে কথা বলছো সবাই! ছন্দ কখনো মরে না। ওদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

তবু ঘন্টাবুড়োকে ওদের কথায় গির্জার ঘন্টা বাজাতে হলো। ঢং ঢং করে ঘন্টাটা বাজছিলো।ওর কান্না পেলো।ঘন্টার শব্দ শুনতে ওর একেবারেই ভালো লাগছিলো না। বারবার বিড় বিড় করে বলছিলো–প্রভু, দেখলো তো।নতুন বছরে ওরা ছন্দকে বাঁচতে দিতে চায় না।তুমি শুধু দেখে রাখো প্রভু, আমাদের ছন্দকে সবাই মিলে কী ভাবে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে।ও না থাকলে যে কোনো কিছুরই অর্থ থাকবে না!

পল গোমেজের বাবা

বাবার কথা বলতেই পল যেন কেমন হয়ে যেতো। আমাদের মিশনারি ইশকুলের ইনফ্যান্ট ক্লাশ থেকে সেভেন অব্দি ওকে দেখে আসছি। নতুন ক্লাশে উঠলে নতুন টিচাররা সবাইকে প্রশ্ন করেন নাম কী, বাবার নাম কী, কী করেন বাবা–এমনিতরো অনেক কথা।

আমাদের কারো বাবা সরকারী অফিসার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ডাক্তার, কেউ হয়তো অধ্যাপক কিম্বা সাংবাদিক বাবা পেয়েছে। কিন্তু পল গোমেজের বাবা হেরাল্ড গোমেজ বুঝি এদের কারো দলে পড়েন না। বাবা কী করেন,–এই প্রশ্নের জবাব পলের কাছে থেকে কোনো টিচার পাননি।

টিচারদের কেউ ওকে চুপ থাকতে দেখে নরোম গলায় বলেন, বাবা মরে গেছেন বুঝি? পল মাথা নেড়ে জানায়, না।

তিনি কি রিটায়ার্ড অফিসার?

পল আবারও মাথা নাড়ে।

তাহলে?

এই তাহলের জবাব ইশকুলের আট বছরের জীবনে আমরাও কোনোদিন পাইনি।এ কী গোয়ার্তুমি-আমরা ভেবে পেতাম না। তবে পলের ইস্তিরি না করা পোশাক দেখে ভাবতাম ওর বাবা বোধহয় খুব গরিব ।

আসলে তা নয়। বিজু একদিন ফিশ ফিশ করে আমাদের ক'জনকে বললো, আসলে আমার কী মনে হয় জানিস?

এইটুকু বলে বিজু অবাক করা কিছু শোনাবার জন্য একটু থামলো। এই এক বিচ্ছিরি স্বভাব ওর।কথা বলতে বলতে হঠাৎ থামবে।আর কথায় কথায় শুধু আসলে বলবে।

কেন্টু অধীর হয়ে বললো, কী বলবি বলেই ফ্যাল না বাপু।তোর এই বিচ্ছিরি অভ্যেসটা কবে যে যাবে তাই ভাবি।

এদিক ওদিক চেয়ে গলাটা আরেক ধাপ নামিয়ে বিজু বললো, আসলে ওর বাবা নিশ্চয় কোনো বড় ধরনের ডিটেকটিভ হবে।এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

চিনু অবাক আর অবিশ্বাসের গলায় বললো, এ কথা তোর মনে হলো কেন?

বিজু আরো চুপি চুপি বললো, আসলে আমি বিশ্ব গোয়েন্দা সিরিজে পড়েছি, কখনো যদি ....

রাখ তোর বিশ্ব গোয়েন্দা! ওই পচা বইগুলো পড়ে তোর মাথাটা একেবারে পচে গেছে। চিনুর ধমকে বিজু একেবারে মিইয়ে গেলো।

বিজুর কথাটা আমারও মনে ধরেছিলো। বললাম, ওকে মিছেমিছি বকছিস কেন চিনু? আমার বাবা ইন্টালিজেন্স ব্যুরোতে কাজ করেন। বাবা বলেছেন, ডিটেকটিভদের সব সময় ছদ্মবেশে থাকতে হয়। তাদের ছেলেমেয়েরাও কাউকে বলতে পারবে না বাবা ডিটেকটিভ। নিজেদের লুকিয়ে রাখার জন্য ডিটেকটিভরা অনেক সময় ছেঁড়া জামা কাপড় পরে ঘোরে।

আমার কথা শুনে চিনু চুপ হয়ে গেলো। বিজু বললো, আসলে দ্যাখতো। চিনুটার সব কিছুতেই ফেঁড়ন কাটা চাই।

চিনু কটমট করে বিজুর দিকে তাকালো। ইচ্ছে করলেই সে বিজুর কথার জবাব দিতে পারে, তবে এতে ওর দাম বেড়ে যাবে বলে এ যাত্রা চিনু আর কিছু বললো না।

বনির বাবা মস্তো বড় ব্যবসায়ী। দার্জিলিঙে ওদের কয়েকটা চা বাগান ছিলো। সেগুলো বদল করে ক'বছর আগে সিলেটে কয়েকটা চা বাগানের মালিক হয়েছে। রোজ মুক্তো-সাদা দামী ইম্পালা গাড়িতে করে ইশকুলে আসে। একটু পরে বনি বিজ্ঞের মত বললো, আমি যখন দার্জিলিঙ-এর লরেটোতে পড়তাম তখন একটা মজার ব্যাপার দেখেছিলাম।

বনির এই এক ফুটুনি! যে কোনো কথার মাঝখানে গায়ে পড়ে সবাইকে মনে করিয়ে দেবে, ওরা আগে দার্জিলিঙ থাকতো। ভারি উঁট দেখাতো বনি। কেউ ওকে এ নিয়ে কিছু বলতো না, কারণ আমাদের টিচাররা ছুটির দিনে প্রায় ওদের বাসায় যেতেন আর আজগুবি সব খাবার খেয়ে পরদিন কমনরুমে বসে নিজেরা সেসব নিয়ে গপ্পো করতেন।

আমি যেন খুব একটা পাত্তা দেইনি, এমন এক ভাব করে বনিকে বললাম, কী দেখছিলি তোদের দার্জিলিঙে?

আড়চোখে আমাকে একবার দেখে বনি বললো, দেখেছিলাম, অন্তু বলে এক ছেলেকে। আমাদের চেয়েও বড় চায়ের বাগান ছিলো ওদের। অথচ কোনোদিন গাড়িতে চেপে ইশকুলে আসতো না। পলের মতো পোশাক পরতো। আর বাবার কথা কাউকে বলতে চাইতো না। পরে শুনেছি ওর বাবা নাকি ভীষণ কিপ্টে ছিলো। সব সময় নাকি অন্তু আর ওর মাকে মারতো। তাই অন্তু ওর বাবাকে দুচোখে দেখতে পারতো না। বাবার কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে মুখ ঘুরিয়ে নিতো।

এইভাবে কোনো কোনো দিন আমরা বুড়ো দেবদারু গাছটার তলায় বসে পলের বাবার কথা বলতে গিয়ে পুরো টিফিন পিরিয়ডটাই কাটিয়ে দিতাম। পলের বাবাকে নিয়ে যতো আলোচনা হতো, তার চেয়ে বেশি হতো আমাদের বাবাকে নিয়ে। সুযোগ পেলেই আমরা কজন জানিয়ে দিতাম, আমাদের কার বাবা কতো বড় কাজ করেন।

কথা বলতে বলতে এক সময় পলের বাবা হারিয়ে যেতেন। বনিকে আমার হিংসে হতো ওদের ইম্পালা আর সবুজ পাহাড়ের চা বাগানের জন্যে। বিজু আমাকে হিংসে করতো আমার বাবা গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করেন বলে। ও চাইতো ওর বাবা আমার বাবার মতো একটা রোমাঞ্চকর কাজ করুক। অথচ ওর বাবা ছিলেন এক নাম করা অধ্যাপক। টিচাররা যখন ওর বাবার লেখা কোনো বই কিম্বা কোনো সেমিনারে বক্তৃতার প্রশংসা

করতেন, তখন বনি ঠোঁট উল্টে বলতো, প্রফেসররা কতইবা আর বেতন পায়, তাই নিয়ে এতো!'

আমাদের ছোট্ট এই ঈর্ষার জগতের একেবারে বাইরে ছিলো পল। কারণ টিচাররা সকলের বাবার প্রশংসা করতেন–পলের বাবাকে বাদ দিয়ে। অনেকের বাবা ইশকুলে আসতেন। বাড়িতে কোন পার্টি হলে ইশকুলের টিচারদের নেমন্তন্ন করা হতো। পরদিন টিচাররা সবাই মিলে সেই সব পার্টির গল্প করতেন।

একদিন ফিলিপ্স স্যারকে শুনলাম টিফিন পিরিয়ডে কমনরুমে বসে গাঙ্গুলী স্যারকে বলছেন, চমৎকার পার্টি দিয়েছিলেন বনির বাবা।

গাঙ্গুলী স্যার বললেন, ভদ্রলোকের মনটা খুব ভালো।আমাকে ডেকে বাড়ির খবর টবর নিলেন। বিজুর বাবাও চমৎকার ভদ্রলোক। পার্টিতে আলাপ হলো। কি পাণ্ডিত্য, অথচ এতটুকু অহংকার নেই। বয়েসে আমার ছোট বলে আমাকে স্যার ডাকলেন। আমি তো লজ্জায় মরি।

ফিলিপ্স স্যার বললেন, আচ্ছা এই ছেলেটার ব্যাপার কি বলুন তো? বনিদের ক্লাশে পড়ে, পল না কি যেন নাম! ক্লাশে বাবার নাম জিজ্ঞেস করলাম বললো হেরাল্ড গোমেজ বুঝি।কী করে জানতে চাইলাম–ছোঁড়া একেবারে চুপ।কিছুতেই বললো না কী করে ওর বাপ!

আর বলবেন না ওর কথা। গাঙ্গুলী স্যার বিরক্ত মুখে বললেন, আমিও অনেক বলে দেখেছি। একবার সন্দ হলো, আসলে কোনো ভদ্রঘরের ছেলে তো? দেখে শুনে তো ভালোই মনে হয়, তবু বলা তো যায় না। সন্দ চাপতে না পেরে আগের হেড মাস্টার ব্রাদার ওয়াটসনকে বললাম, ওর বাবার পরিচয় টরিচয় ভালো করে জেনে ওকে ভর্তি করিয়েছিলেন তো? ব্রাদার ওয়াটসন প্রথমটায় ভুরু কুঁচকে বললেন–এ কথা কেন বলছেন? আমি তখন আমার সন্দ লাগার কথা বলেই ফেললাম।অমনি তিনি চটেমটে লাল।বললেন, আমার ইশকুলে সে ধরনের কোনো ছেলে পড়ে না।আমি ভালো করেই পলদের জানি। ভবিষ্যতে এ ধরনের কথা বলবেন না। ব্রাদারের রাগ দেখে আমি পালিয়ে বাঁচি।

এইটুকু, বলে গাঙ্গুলী স্যার থামলেন।দাঁতের ফাঁক থেকে ময়লার কণা খুঁচিয়ে বের করে থুক করে ফেলে বললেন, দূর হোকগে ছাই! কার বাপ কী তা নিয়ে আমি মাথা ঘামই কেন।আমি ঠিক থাকলেই হলো, কী বলেন ফিলিপ্স স্যার?

গাঙ্গুলী স্যারের কথা শুনে বুড়ো ফিলিপ্স স্যার খিক খিক করে বেদম হাসলেন।আমার কিন্তু একটুও ভালো লাগলো না।পলকে কেউ খারাপ ভাবুক এটা আমি চাইতাম না।ওর মতো সুন্দর শান্ত চোখের ফুটফুটে চেহারার কারো বাবা খারাপ হতে পারে এ আমি ভাবতেই পারতাম না। গাঙ্গুলী স্যারের কথা ভীষণ খারাপ লেগেছিলো। বড়রা এত খারাপ কথাও ভাবতে পারে!

পলকে আমার খুব ভালো লাগতো। ওকে আমি সব সময় আমাদের দলে পেতে চাইতাম, অথচ ও নিজেকে সারাক্ষণ শামুকের মতো গুটিয়ে রাখতো।একদিন টিফিন

খাওয়ার সময় ভাব জমাবার জন্য ওকে ডেকেছিলাম, আমাদের সঙ্গে খেতে।ও বললো, খিদে নেই।আর বনি বললো, ঢং।এরপর ওকে আর দলে টানতে সাহস পাইনি।

একদিন মনে হলো, সবাই পলকে অপছন্দ করা শুরু করেছে।বিজুকে বাড়ি গিয়ে পড়ান গাঙ্গুলী স্যার।ও বললো, জানিস, গাঙ্গুলী স্যার বলেছেন, পলের সঙ্গে যেন না মিশি।

শুনে আমার মুখ কালো হয়ে গেলো।বিজু বললো, আসলে কেন মানা করেছেন।তুই কিছু জানিস?

গাঙ্গুলী স্যার কেন মানা করেছেন আমি জানি।কিন্তু বিজুকে সে কথা বলা যাবে না।বিজু কেন, কাউকেই বলা যায় না।বিজুর কথায় আমি কাষ্ঠ হেসে বললাম, গোয়েন্দাদের ছেলেদের সঙ্গে না মেশাই ভালো।

বিজু বললো, আমিও তাই ভাবছিলাম।আসলে ওর সঙ্গে মিশলে ও বোধ হয় কোনো খবর টবর বার করে ওর বাবাকে বলে দেবে, তাই নারে?

শুনে রাগ হলো, আবার হাসিও পেলো, বললাম, এমন কী খবর তুই জানিস যা পলের বাবাকে জানতে হবে? যা, পালা এখান থেকে।আমার ভালো লাগছে না।

ক্লাশে ছেলেরা পলকে যতো অপছন্দ করছিলো ওর জন্য আমার ততোই কষ্ট হচ্ছিলো। ভাবছিলাম, কিছু একটা করি ওর জন্য।কিন্তু কী করবো ভেবে উঠতে পারছিলাম না। শেষে একদিন পলকে এক লাইনের চিঠি লিখলাম—পল, আমি তোমার বন্ধু হতে চাই।

চিঠিটা পলের হোমটাস্কের খাতায় লুকিয়ে রেখেছিলাম, টিফিন পিরিয়ডের এক ফাঁকে। পরদিন পল সকালে আমাকে দেখে হাসলো।কাছে এসে বললো, ছুটির পর ভিক্টোরিয়া পার্কে এসো।

আমাদের ইশকুল থেকে মাত্র দু'মিনিটের পথ ভিটোরিয়া পার্ক।বাড়ি ফেরার পথেই পড়ে।ইশকুল ছুটির পর বিজু চিনুদের কাটাতেই লাগলো বেশ কিছুক্ষণ।পার্কে এসে দেখি মস্তো বড়ো রেইনট্রি গাছের তলায় পল একা বসে আছে।আমাকে দেখে ও মৃদু হেসে বললো, কখন থেকে বসে আছি!

বললাম, বিজু চিনুদের জন্যে দেরি হয়ে গেলো।

পল কোনো কথা না বলে শুধু একটু হাসলো।আমি ওর পাশে বসে দুব্বো ঘাসের ডগা চিবুচ্ছিলাম।বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললাম, পল কিছু বলছে না যে?

পল আগের মতো হেসে বললো, কি বলবো?

আমি বললাম, আগে চিঠির জবাব দাও।

পল লজ্জা পেলো।বললো, তোমার তো অনেক বন্ধু।

থাক না অনেক বন্ধু! সবাইতো কেবল হিংসে করেই সারা হলো।আর যতো বাজে গপ্পো।আমার একটুও ভালো লাগে না।

পল এবার গম্ভীর হয়ে বললো, তোমার বন্ধুরা কেউ আমাকে পছন্দ করে না।

জানি।সেজন্যে আমার আরো খারাপ লাগে।বলল, তুমি আমার বন্ধু হবে?

আমি পলের দিকে হাত বাড়ালাম।পল হেসে আমার হাতে হাত রেখে শুধু বললো, বন্ধু।

আমি এবার হাসলাম।বললাম, পল, একদিন সবাইকে নিয়ে তোমাদের বাসায় যাবো। পল বললো, আমাদের বাড়ি যে তোমাদের ভালো লাগবে না! যার ভালো না লাগে সে যাবে না।আমি যাবো।পল একটু ভেবে বললো, তাহলে মাকে বলবো।

পরদিন ইশকুলে গিয়ে সবাইকে বললাম, আমি পলের বাড়ি যাচ্ছি।তোমাদের যার ইচ্ছে যেতে পারো।

শুনে দু'একজন প্রথমে একটু ইতস্তত করলেও পরে সবাই বললো, যাবে। কেন্টু বললো, ওর বাবার সঙ্গে দেখা হবে তো!

বললাম, নিশ্চয়ই হবে।

কদিন পরেই ছিলো বড়দিন।পল আমাকে বললো, মা বলেছে তোমাদের সবাইকে বড়দিনের নেমন্তন্ন জানাতে।সবাই সন্ধ্যেয় আমাদের বাসায় আসবে।

বনি বললো, বিপদ হলো, ওদিকে যে আমাদের গাড়ি যাবে না।কী যেন নাম বললে গলিটার?

আমার ভারি রাগ হলো।বললাম, ইচ্ছে হলে হেঁটে যাবে।তোমাকে তো পা ধরে কেউ সাধছে না।

বনি ঘাড় বাঁকিয়ে বললো, আমি তোমাকে বলিনি।ভারি তো এক–

বনিকে একটা শক্ত কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলাম।বিজু বললো, তুই কোন ড্রেসটা পরবি? আসলে আমি ভাবছি নতুন সুটটা সেদিন পরবো।

আমি রেগে বললাম, যা সব সময় পরি তাই পরে যাবো।আমার অতো ফুটুনি নেই।

আমার কাছে সুবিধে করতে না পেরে বিজু গেলো কেন্টু, চিনু, বনিদের সঙ্গে জামা কাপড় নিয়ে কথা বলতে।এটা যে বিজু বাড়াবাড়ি করেছে তা বলবো না।আমাদের কারো বাড়িতে পার্টি থাকলে আমরা আগে ঠিক করে নিই কে কী পরে যাবো।বিজুকে বলতে শুনলাম, আমার নাকি ভারি দাম বেড়েছে।আর বনিও ওর কথায় সায় জানালো। আমি কিছু বললাম না।

বড়দিনের বিকেলে আগে আমরা ইশকুলে এলাম।সবার পরনে দামী প্যান্ট শার্ট।বিজু আর বনি জ্যাকেট পরেছে।আমি শুধু সাদা প্যান্ট শার্ট আর নীল পুলোভারটা পরে এসেছি।এই পোশাক পরে আমি ক্লাশেও যাই।

পল এলো আমাদের নিয়ে যেতে।ওর পরনেও সাদা প্যান্ট শার্ট।গায়ে নতুন আকাশ নীল পুলোভার।আমাকে দেখে হাসলো।কানে কানে বললো, তোমার মতো একটা পুলোভার পেয়েছি এবার বড়দিনে।ভারি লোভ ছিলো তোমারটার ওপর।

কি যে সুন্দর লাগছিলো পলকে বলে বোঝাতে পারবো না।ও হাসছিলো।এরকম হাসি কোনোদিন ওর মুখে দেখিনি।আমরা সবাই হইচই করে কথা বলতে বলতে ওদের বাড়ি গেলাম।

তিনখানা কামরায় ছোট্ট বাড়ি।সামনে এক চিলতে বাগানে সিজন ফ্লাওয়ারের মেলা বসেছে।সব কিছু সুন্দর সাজানো।বসার ঘরে ক্রিসমাস ট্রি রাখা হয়েছে।জরির সুতো, রূপোলি তারা আর লাল নীল পারদে রাঙানো বল ঝুলছে সেখানে।আরো একটা জিনিস ছিলো সারা ঘর জুড়ে।দেখে আমরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম–কী চমৎকার বেলুন! আর এতো বেলুন! কী আশ্চর্য বেলুন! সারা ঘরে বেলুন ঝুলছে।রঙিন ছবি আঁকা বেলুন সব।কোনটায় মিকি মাউস, কোনটায় ডোনাল্ড ডাক, আবার কোনটায় হাম্পটি ডাম্পটির ছবি।

পলের জন্য আনা উপহারগুলো আমরা ক্রিসমাস ট্রির গোড়ায় রাখলাম।ভেতরের দরজা ঠেলে একজন বসার ঘরে ঢুকলেন।পল বললো, আমার বাবা।

আমরা তাঁকে দেখলাম।মুগ্ধ হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।ধুসর প্যান্ট আর সাদা সার্ট পরনে।ওপরে শ্যাওলা সবুজ কার্ডিগান! রূপকথার রাজাদের মতো সুন্দর দেখতে।নীল চোখ, টিকোলো নাক, সোনালি চুল।আমাদের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, পল তোমাদের কথা অনেক বলে।আমি কতদিন বলেছি, নিয়ে আয় এক রোববারে।বলে, ওরা কী আসবে!

কেন্টু বললো, কী মিথ্যে কথা! পল একবারও আমাদের বলেনি।এবার তাহলে এলাম কী করে?

পল লজ্জায় হাসলো।ওকে আরো সুন্দর মনে হলো।

পলের বাবা বললেন, এবার বড় দিনটা ভারি চমৎকার মনে হচ্ছে।পলের মাকে ডেকে বললেন, জানো নেলী, আমাদের সারডিনিয়াতে এখন ঠিক বরফ পড়ছে।ওখানে বলে বরফ না পড়লে বড়দিনের সব মজা মাটি।পলের মতো ছোট থাকতে আমি সারাক্ষণ শুধু জানালা দিয়ে বরফ দেখতাম।মাঝে মাঝে এতো বরফ পড়তো যে জানালার কাঁচ বরফের দেয়াল হয়ে যেতো।আমি তখন একটা মোমবাতি জ্বেলে জানালার পাশে রাখতাম।বরফের দেয়ালে একটা গোল ফুটো হতো, তারপর আস্তে আস্তে গলে যেতো।

আমরা অবাক হয়ে শুনছিলাম।মনে হলো রূপকথা শুনছি।পলের বাবা বুঝি রূপকথার পাতা থেকে থেকে উঠে এসে অচেনা এক সারডিনিয়ার বরফ ঝরার গল্প শোনাচ্ছেন। তার নীল চোখে বরফের স্বপ্ন ভাসছিলো।আমরা বললাম, আরো বলুন।

তারপর পুরানো ঢাকার আরো পুরানো এক শ্যাওলা ধরা গলি থেকে আমরা হারিয়ে গেলাম সারডিনিয়ার বিশাল পাইন বনের ধারের ছোট্ট এক লগ কেবিনে।যেখানে বল্গা হরিণ-টানা স্লেজ গাড়িতে চড়ে দাড়ি উড়িয়ে টুপি মাথায় জোব্বা গায়ে সান্টা ক্লজ আসেন বড়দিনের উপহার নিয়ে।বাতাসে ভেসে আসে পাইন আর মেপল পাতার ভেজা মিষ্টি গন্ধ।ঘরের ভেতর ফায়ার প্লেসের আগুনের ধারে বসে গিটার বাজিয়ে পাশের গাঁয়ের হ্যাঁমিল্টন বুড়ো গান গায়।বহু দূরে ট্রেনের হুইসেল শোনা যায়।পাইনের বনে

সেই শব্দ কেঁপে কেঁপে ফেরে। একসময় বাতাসে বাইরের সব শব্দ মিলিয়ে গিয়ে শুধু পাইন বনের একটানা শাঁ শাঁ শব্দ হয়। মনে হয়, বুঝি ঝড় আসবে। জানালার ধারে জ্বালিয়ে রাখা মোমবাতিটা গলে গলে শেষ হয়। হ্যাঁমিল্টন বুড়োর গান শেষ হলে দিদিমা পিয়ানোয় সুর তোলেন–সেদিন সবুজ হ্রদের ধারে। মা রান্না করেন ভেড়ার মাংস, মটরসুটি আর বাঁধাকপির স্যুপ।বড়দিনের জন্য বাবা নরোম রুটি আনতেন শহর থেকে।টেবিলে টার্কি মোরগের বড় রোস্ট রাখা হতো।টার্কি ছাড়া কি বড়দিন জমে! সব মিলিয়ে অদ্ভুত সুন্দর ছিলো সারডিনিয়ার বড়দিন।

এরপর পলের বাবা বললেন জাহাজে করে দেশ ঘোরার কথা।জানো আমাদের রক্তে রয়েছে ঘুরে বেড়ানোর নেশা। আমার বাবা এদেশের মানুষ ছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে একদিন কানাডা গিয়ে, সেখানে মাকে বিয়ে করে আস্তানা গাড়লেন। বাবা মা মরে গেলে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। অনেক ঘুরে লস এঞ্জেলেস গিয়ে এক বন্ধুর কাছে উঠলাম। বন্ধু বললো চলো আর্মিতে জয়েন করি। আমিও বললাম, ঠিক আছে। দু'জন আর্মিতে ঢুকলাম। এর কদিন পর শুরু হলো কোরিয়ার যুদ্ধ। আমাদের দুজনকেই পাঠানো হলো কোরিয়ায়।

এই বলে থামলেন পলের বাবা। তাঁর মুখটা হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে গেলো। আস্তে আস্তে বললেন, তোমরা যুদ্ধ দেখোনি। যুদ্ধ খুব খারাপ জিনিস। আমাদের লড়তে বলা হয়েছিলো কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। প্রথমদিকে উত্তেজনা ছিলো। পরে দেখি যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি তারা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, আমাদের ওরা বলতো ভাড়াটিয়া সৈন্য। খুব খারাপ লাগতো। একদিন বাঙ্কারের ভেতর আমরা দুজন বসেছিলাম। আমার বন্ধু বললো, যুদ্ধ করতে একদম ভালো লাগছে না। আমরা পালাবার ফন্দি করলাম। রাতে পালাতে গিয়ে আমার বন্ধুটি আমাদের পাহারাদার সৈন্যদের গুলি খেয়ে মারা পড়লো। আমি অনেক ঘুরে এক জাহাজে চাকুরি জুটিয়ে তোমাদের দেশে এলাম।

বলতে বলতে আবার উদাস হয়ে গেলেন পলের বাবা।কিছুক্ষণ।এরপর একবার পলের মায়ের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলেন–নেলীর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর এ দেশটাকে এতো ভালো লেগে গেলো যে, এখানেই থেকে গেলাম। এই বলে পলের মায়ের দিকে তাকালেন–কিগো ভালো করিনি!

পলের মা হেসে বললেন, তুমি তো ভালো করেছো, তোমার ছেলে পল কোথায় ভালো করতে যায় দেখো!

পলের বাবা শব্দ করে হাসলেন।আমরাও হাসলাম। পল ভীষণ লজ্জা পেলো। বললো, আমি এদেশ ছেড়ে কোথাও যাবো না মা।

বিজু বললো, আসলে এটাইতো তোমার দেশ পল।

বিজুর আসলে বলা নিয়ে এবার আমরা কেউ হাসাহাসি করলাম না।শুধু পল যখন মুখ টিপে হেসে বললো, আসলেই তাই।তখন সবাই হেসে গড়িয়ে পড়লাম।

বড়দিনের সেই সন্ধ্যেটা যে কি আনন্দে কেটেছিলো বলে বোঝাতে পারবো না।রাতে আমরা সবাই পলের ঘরে বসে গল্প করছিলাম। চিনু বললো, তোমার দাদী যে আমেরিকান ছিলেন এ কথা তুমি আগে বলোনি কেন পল?

পল লজ্জার হাসি হেসে বললো, বারে এতে বলার কী আছে?

কেন্টু বললো, পলের বাবা সেজন্যেই আমেরিকান ছবির নায়কদের মতো দেখতে।

চিনু বললো, আচ্ছা পল এবার তো তুমি বলবে, তোমার বাবা কী কাজ করেন, এটা তুমি বলতে চাও না কেন?

একটু গম্ভীর হলো পল।বললো, বাবা আজ তোমাদের তার যুদ্ধের যাবার কথা বলছেন। এমনিতে বাবা কিন্তু এসব নিয়ে কথা বলা পছন্দ করেন না।বাবা বলেন যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা অপরাধ।তাছাড়া বাবার কথা না বলার আরো একটা কারণ আছে।শুনে তোমরা হাসাহাসি করবে বলে বলিনি।

কেন্টু অবাক হলে বললো, হাসাহাসি করবো কেন?

পল একটু চুপ থেকে লাজুক হাসলো।বললো, মামারা সবাই বাবাকে নিয়ে হাসাহাসি করেন।বলেন বেলুনওয়ালা।আমাদের বাসায় যে বেলুনগুলো দেখেছো এগুলো বাবা বানিয়েছেন।বাবার ছোট্ট একটা বেলুন বানাবার মেশিন আছে।বাবা কী করেন বললে আমাকেও যে বলতে হয় বেলুনওয়ালা।

বনি এতক্ষণ চুপ করে ছিলো।বললো, তা কেন হবে পল? আমার বাবাকেও যে তাহলে বলতে হয় চাওয়ালা।

কেন্টু হেসে বললো, আমার বাবা তাহলে জুতোওয়ালা।

আমরা সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলাম।পলও হাসলো।আমি পলের কাছে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, তোমার বাবা এত সুন্দর বেলুন বানাতে পারেন এ আমি ভাবতেও পারি না।আমি তোমাকে হিংসে না করে পারছি না পল।

বিজু বললো, আসলে পলের বাবা সারা জীবন কতো অ্যাডভেঞ্চার করেছেন দেখলি?

আমাদের যাবার সময় হলো।পলের বাবা আমাদের সবার হাতে একটা করে রঙিন বেলুনের বাক্স ধরিয়ে দিয়ে বললেন, যতবার আসবে ততবার বেলুন পাবে।

বনি বললো, তাহলে আপনার সব বেলুন ফুরিয়ে যাবে।

পলের বাবা বললেন, তোমাদের জন্য আমার বেলুন কখনো ফুরোবে না।

পলের মা বললেন, আমাদের বেলুন পলের বন্ধুদের জন্য।

আমরা চারজন বড়দিনের সেই রাতে হাঁটছিলাম ফাঁকা রাস্তা দিয়ে।কুয়াশায় ঢেকে আছে সারা রাস্তা।আমরা সবাই ভাবছিলাম, আমাদের বাবা যদি পলের বাবার মতো হতেন।আমরা যখন আলাদা হবো তখন বনি বললো, পলের বাবার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।

বড়দিনের সেই রাতে পলের বাবা আমাদের ঘুমের ভেতরও নিয়ে গিয়েছিলেন সারডিনিয়ার এক বরফঝরা বনের ধারে। যেখানে বড়দিনের রাতের জানালার ধারে মোমবাতি জ্বলে, জানালার কাঁচে জমে থাকা বরফ মোমের মতো গলে গলে পড়ে, আর হ্যাঁমিল্টন বুড়ো গিটার বাজিয়ে গায়–সেই সব দিন, আহা সেই সব দিন.....

পিয়ানো ভূতের গল্প

সেবার আমাদের মিশনারি ইশকুলে একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেলো। ফোর থেকে ফাঁইভে উঠেছি। তখনও বইয়ের লিস্ট দেওয়া হয়নি। টিচাররা ক্লাশে ঢুকেই গল্প জুড়ে দিতেন; সারাদিন শুধু রকমারি গল্প আর গল্প। তবে সব টিচারের গল্প শুনতে যে ভালো লাগে, এমন কথা বলছি না। শুভদারঞ্জন স্যার মুখখানা হাঁড়ির মতো গম্ভীর করে কি সব আত্মা আর মুক্তির গল্প শোনাতেন; আমার একেবারে ভালো লাগতো না। হয়তো পলুকে বলেছি—এরচে নিকোলাস স্যার ঢের ভালো গল্প বলেন। অমনি গম্ভীর গলায়—কথা বলে কে? আমরা তখন ভেজা বেড়ালটির মতো চুপ।

টিচারদের মধ্যে গাঙ্গুলী স্যারই শুধু গল্প বলতেন না। গতবারের মতো তিনি ক্লাসে ঢুকে চেয়ার টেনে বসে পা দু'খানা টেবিলে তুলে দিয়ে পরম শান্তিতে ঘুমোতেন। আমরা এতে আরো খুশি। ইচ্ছেমতো হৈ-চৈ করো, কেউ বারণ করবে না।

আমাদের বেশিদিন গাঙ্গলী স্যারের ভাগ্য সইলো না। কদিন পরে দেখি তার বদলে এক ব্রাদার এসেছেন। একেবারে খাঁটি সাহেব হলেও আমি প্রথম দিন ব্রাদার পিটারকে দেখে হাসি চাপতে পারিনি। ফাদার ফিলিপস আমাদের প্রত্যেক রোববারে উপাসনার পর বায়স্কোপ দেখাতেন। সেখানে আমরা মিকি মাউস, ডোনাল্ড ডাক আর লরেল-হার্ডির ছবিই বেশি দেখতাম। বিশ্বাস করো, ব্রাদার পিটারকে দেখে আমার ঠিক বেঁটে-মোটা হার্ডির কথা মনে হয়েছিল। গোল চোখ, ছোট্ট ভোতা নাক, মাথায় কদম ছাঁট, সব মিলিয়ে ব্রাদার পিটারকে হার্ডি ছাড়া আর কিছু ভাবা যেতো না। সে জন্যে কদিন পর থেকে আমরা সবাই তাকে ব্রাদার হার্ডি বলে ডাকতে শুরু করেছিলাম।

ব্রাদার হার্ডি আমাদের শোনালেন পিয়ানো ভূতের গল্প। ব্রাদার হার্ডি দশ বছর আগে আমাদের ইশকুলে প্রথম এসেছিলেন। চার বছর এখানে থেকে তারপর চলে গিয়েছিলেন বোর্নিও দ্বীপে। ছ'বছর সেখানে থেকে বহু 'অসভ্য ভ্রান্ত মেষ শাবককে' যীশুর ভক্ত বানিয়ে আবার আমাদের কাছে এসেছেন। একবার নাকি সেখানকার এক বুড়ি তাঁকে কুক্‌রী দিয়ে কুপিয়ে মারতে এসেছিলো। বুড়িকে ঈশ্বরের ভ্রান্ত শেষ শাবক বলাতে নাকি খুব চটে গিয়েছিলো।

একদিন ক্লাসে কথায় কথায় ব্রাদার হার্ডি বলছিলেন, আইচ্ছা, তোমরা কইতে পারো নাকি, আমাদের ক্রিকেট খেলার মাঠটা একটু নিচা ক্যান?

ব্রাদারদের বাংলা বলার ধরণ ছিলো এমনি। আমরা কেউ বলতে পারলাম না কেন এমন হলো। বলবোই বা কেমন করে। এ নিয়ে যে আগে কখনো মাথাই ঘামাইনি। বললাম, আপনিই বলুন ব্রাদার, কেন মাঠটা নিচু হলো?

আমার কথা শেষ না হতেই বিজু বললো, আসলে হয়তো ভূমিকম্প হয়েছিলো।

ওকে একটা রাম চিমটি কেটে বললাম, তুইতো সবই জানিস আসলে। একটু চুপ থেকে শোন না!

ওর একটা ভারি বদ অভ্যাস–কথায় কথায় 'আসলে' বলবে। আর কথার মাঝখানে কথা বলবে।আমার যা রাগ হতো শুনে সে কথা বলার নয়।

ব্রাদার বললেন, ওইখানে আগে একটা পুষ্করণী আছিলো।

মানে পুকুর? আমাদের চোখ আলু হয়ে গেলো।ইশকুলের মাঝখানে পুকুর! এমন কথা আমরা আগে কখনো শুনিনি।

ব্রাদার মাথা দোলালেন–হ, পুকুর।তোমরা তাইলে শোন নাই।ওইখানে মস্তবড় পুষ্করণী আছিলো।এই বলে ব্রাদার বিজুকে বললেন, কওতো পুষ্করণী কই গ্যাছে?

বিজু উঠে তড়বড় করে বললো, আসলে হয়তো চুরি হয়ে গেছে।

ক্লাশের সবাই ওর কথা শুনে হেসে উঠলো। আমি ওকে আরেকটা রাম চিমটি কেটে বললাম, খুব বুঝেছিস, পুকুর কখনো চুরি হয় নাকি রে?

ব্রাদার হার্ডি হাসতে হাসতে বললেন, না চুরি হয় নাই। ওইটা মাটি দিয়া ভরিয়া ফ্যালাইছিলো।এই বলে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন।

কেন্টু বললো, পুকুর কেন ভরিয়েছিলো ব্রাদার?

ব্রাদার ওর দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, ব্রাদার অ্যালিস্টর এই ওই পুষ্করণীতে ডুবিয়া মরিয়াছেন। তারপর ওইটারে মাটি ফালাইয়া বন্ধ করা হইয়াছে।

এরপর ব্রাদার হার্ডি বলেছিলেন, ব্রাদার অ্যালিস্টরের কথা। ভারি বদমেজাজী ছিলেন ব্রাদার অ্যালিস্টর।শুকনো খিটখিটে চেহারা।যখন যাকে কাছে পান তাকেই ধমকে দেন। একদিন তো অনারেবল বিশপকেই কি যেন বলে ফেলেছিলেন। তাই নিয়ে সে এক যাচ্ছেতাই কাণ্ড।শেষটায় মিশনের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে তবে রক্ষা।অনারেবল বিশপ তাঁর মেজাজের কথা জানতেন বলেই বেশি কিছু করেননি। এমিনতরো হাজার কাণ্ডের নায়ক ছিলেন ব্রাদার অ্যালিস্টর।

সেই নিরস মানুষটির ভারি অদ্ভুত এক শখ ছিলো।সে হলো পিয়ানো বাজানোর সখ । তার একটা মস্তো বড় ভিটোরিয়ান পিয়ানো ছিলো।চিল ডাকা দুপুরে অথবা ঝিঁঝি ডাকা রাতে যখন সবকিছু নিঝুম থাকতো, তখন ব্রাদার অ্যালিস্টর আপন মনে পিয়ানো বাজাতেন।ওই ছিলো তার সখ।অন্য ব্রাদারদের হরেক রকমের সখ থাকে।কেউ স্ট্যাম্প আর জলছবি জমান। কেউ ছবি তোলেন। কেউ সময় পেলেই টেবিল টেনিস খেলেন। ফাদার ফিলিপ্স তো দিনরাত বায়স্কোপ নিয়েই পড়ে থাকতেন আর চুইংগা চিবুতেন। ব্রাদার অ্যালিস্টর পিয়ানো ছাড়া কিছুই পছন্দ করতেন না।

গির্জাঘরের পেছনে বুড়ো নিমগাছটা, যার নীচে পাথরে খোদাই করা মা মেরীর একটা চমৎকার মূর্তি আছে, তারই দেয়াল ঘেঁসে ব্রাদার অ্যালিস্টরের ঘর। এখন সেটাকে তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে।সেই ঘরে থাকতেন ব্রাদার অ্যালিস্টর।আপন মনে সেখানে বসেই পিয়ানো বাজাতেন।

খেলতে খেলতে আমরা অনেক সময় ক্রিকেট মাঠ পেরিয়ে সেখানে গিয়েছি।তালাবদ্ধ ঘরটাও দেখেছি।কিন্তু কখনো ভাবিনি ঘরটা বন্ধ কেন।ব্রাদার হার্ডি বললেন–এখনো নাকি পিয়ানোটা ওই ঘরেই আছে।

ব্যাপারটা ঘটেছিলো ব্রাদার অ্যালিস্টর ডুবে মরার কদিন পরে।কি মনে করে সেদিন দুপুরে ইশকুলের বুড়ো দপ্তরি ধনাই গিয়েছিলো নিমগাছের ওদিকটায়।মা মেরীর কাছে কি যেন প্রার্থনা করছিলো, এমন সময় শুনলো টুংটাং পিয়ানো বাজছে। ধনাই তো অবাক। শব্দটা আসছিলো ব্রাদার অ্যালিস্টরের ঘর থেকে। কার আবার পিয়ানো বাজানোর শখ হলো, এই ভেবে ধনাই জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে ব্রাদার অ্যালিস্টর আপন মনে পিয়ানো বাজাচ্ছেন।জানালায় খুট করে শব্দ হতেই ব্রাদার রেগে কটমট করে ওর দিকে তাকালেন।ধনাই নেমে এলো।ব্রাদার অ্যালিস্টর তাই বলো, আমি ভাবি আর কে।এই ভেবে ও হাঁপ ছাড়তে যাবে, তক্ষুনি মনে পড়লো ব্রাদার অ্যালিস্টর না ক'দিন আগে মারা গেলেন? অমনি ধনাই চোখ কপালে তুলে, দাঁত কপাটি দিয়ে আঁ-আঁ করে মুর্খা গেলো।

মুছা ভাঙতে ধনাই দেখে চারপাশে বাবুর্চি লিস্টার, ঘন্টাবুড়ো প্যাট্রিক, আর স্ট্যাম্পঅলা অ্যান্টনী।

ধনাই করুণ কণ্ঠে বললো, আমি কোথায়?

ওরা জবাব দিলো, তোমার ঘরে।

আমি এখানে এলাম কী করে?

লিস্টার বললো, তা কী করে বলি।আমি এসে শুনি তুমি বিছানায় শুয়ে গোঁ গোঁ করছে। তারপর.....।

ঘন্টাবুড়ো প্যাট্রিক ওকে থামিয়ে দিয়ে বললো, আমিই প্রথম শুনেছি লিস্টার, আমি ডাকতেই না তুমি এলে!

লিস্টার রেগে বললো, তুমি কক্ষনো আমাকে দেখতে ডাকোনি প্যাট খুড়ো। আমিই তো–।

ধনাইর এদিকে কোনো খেয়াল নেই।যখন বুঝলো –ওরা কেউ ওকে উঠিয়ে আনেনি, তখনই—এ্যাঁ তাহলে ব্রাদার এলিস্টরই আমাকে এখানে আনলো নাকি? বলেই বুকে জুস একে ধনাই আবার চোখ কপালে তুলে ভির্মি খেলো।তিনদিন তিনরাত সে আর উঠে বসে না।চোখ মেলে তাকিয়ে কথাটা মনে করে, আবার বুকে ক্রস এঁকে ভির্মি খায়।

ধনাইয়ের পরে দেখলো বাবুর্চি লিস্টার। তারপর ঘন্টাবুড়ো প্যাট্রিক, স্ট্যাম্পঅলা অ্যান্টনী, বিউগল কাকা কেউ বাদ পড়লো না। সবাই নিজ কানে শুনলো ব্রাদার অ্যালিস্টরের ভূত ঘরে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছে।

শেষে একদিন পুকুরটা ভরিয়ে ফেলা হলো। কি আশ্চর্য, এরপর আর কেউ পিয়ানো বাজানো শোনেনি। ধনাই অবশ্য পরে ওকথা ভেবে অনেকবার ভির্মি খেয়েছে। তবে ওর কথা আলাদা।

পিয়ানো ভূতের গল্প নিয়ে আমরা কদিন মেতে রইলাম। শুভদারঞ্জন স্যারকে জিজ্ঞেস করতে তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, হতে পারে। কোনো কারণে যদি আত্মার মুক্তি না ঘটে তাহলে এরকম হয়ে থাকে। বিশেষত অপঘাতে মৃত্যুতে। এরপর তিনি পুরো একঘন্টা অপঘাতের মৃত্যু আর তার মুক্তির কথা শোনালেন সবাইকে।

কিছুদিন যাবার পর পিয়ানো ভূতও পুরনো হয়ে গেলো। নতুন বইয়ের লিস্ট দেয়া হয়েছে। সবাই বইয়ে চকচকে ছবিঅলা মলাট লাগাতে ব্যস্ত। নতুন নতুন খাতা বানানো হচ্ছে। নতুন বই খাতায় কী চমৎকার গন্ধ! শুকলে বুকটা ভরে যায়।

এমন সময় একদিন আবার নতুন করে পিয়ানো ভূতের উৎপাতের কথা শোনা গেলো। এবার আমাদের নিজেদের শোনা, অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই। টিফিনের ঘন্টা শেষ হবার অল্প আগে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো পন্টু। ওর চোখমুখ দেখে মনে হলো এক্ষুণি বুঝি ভির্মি খাবে।

সবাই ওকে ঘিরে হাজারটা প্রশ্ন, রীতিমতো হৈ চৈ! ব্রাদার হার্ডি এসে বললেন, কি হইয়াছে পলু?

পলু তখন আস্তে আস্তে সব খুলে বললো। টিফিনের ঘন্টা বাজার পরে পলুর মনে হলো, মা মেরীর কাছে গিয়ে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে। এই ভেবে ভালো মনে পলু গেলো ঘোড়া নিমের গোড়ায়। ব্রাদার এলিস্টরের ঘরের দরজায় নিচের সিঁড়িতে টিফিনের কৌটাটা রেখে পলু প্রতিজ্ঞা করতে গেলো। কতক্ষণই বা হবে—বড়জোর তিন মিনিট! ফিরে এসে দেখে সিঁড়ি ফাঁকা, কৌটা নেই। আশেপাশে তাকিয়ে দেখে কেউ কোথাও নেই। ঠিক তখনি পলু শুনতে পেলো ব্রাদার অ্যালিস্টরের ঘরে পিয়ানো বাজছে। এর পরই সে ছুটে পালিয়ে এলো।

শুনে সবার চোখ ট্যারা হয়ে গেলো। ব্রাদার হার্ডি তো বারবার বুকে ক্রুস আঁকেন, আর বললে, সত্যই শুনিয়াছ? সত্যই?

আমরা সবাই রায় দিলাম—এটা পিয়ানো ভূতেরই কাণ্ড। ব্রাদার হার্ডি তখন পলুকে একগাদা ক্যান্ডি আর চকোলেট খেতে দিলেন। সবার জুলুজুলু চোখের সামনে পলু সবগুলো ক্যান্ডি খেয়ে ফেললো। আমরা শুধু ঢোক গিলোম।

পরদিন আরেক কাণ্ড! ব্রাদার হার্ডির ক্লাশে পলু তার পেন্সিল খুঁজে পেলো না। ব্রাদার বললেন, কোথায় হারাইয়াছ?

পলু মাথা নিচু করে বললো, টিফিনে খেলতে খেলতে নাকি ঘোড়া নিমের ওপাশটায় গিয়েছিলো। শেষে হয়রান হয়ে ব্রাদার অ্যালিস্টরের সিঁড়িতে বসেছিলো। হঠাৎ ওর মনে হলো, প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে কে যেন পেছন থেকে পেন্সিলটা টেনে নিয়ে গেলো।

ও ভাবলো বিজু বুঝি! কিন্তু তাকিয়ে দেখে কেউ নেই সেখানে। আর তখনই ঘরের ভেতর পিয়ানোর শব্দ শোনা গেলো।ও ছুটে চলে এলো।

ব্রাদার বললেন, তোমার যাওন উচিৎ আছিলো না। এরপর ব্রাদার তাকে চমৎকার একটা বিদেশী পেন্সিল দিলেন।ওটার গায়ে মিষ্টি গন্ধ, কি সুন্দর দেখতে!

পরদিন সকালে মন্টির খাতা হারালো। সে নাকি খাতাটা ব্রাদার অ্যালিস্টরের দরজার সামনে রেখেছিলো। আর টিফিনে রোজারিওর যে বড় রাবারটা হারালো, তাও ব্রাদার অ্যালিস্টরের দরজার সামনে সিঁড়িতে বসেছিল বলে ।

ব্রাদার হার্ডি সব শুনে–কি আইশ্চর্য! কি আইশ্চর্য! বলে মন্টি আর রোজারিওকে অদ্ভুত সুন্দর দুটো খাতা আর রাবার দিলেন।

এরপর যে কি কাণ্ড! প্রত্যেক দিন ক্লাশের কারো না কারো কিছু হারানো শুরু হলো। এসব যে পিয়ানো ভূতেরই কাজ এ ব্যাপারে কারো মনে সন্দেহ রইলো না।আর তারই মাশুল দিতে লাগলেন গোবেচারী ব্রাদার হার্ডি।তিনি শুধু আপন মনে বলতেন, ব্রাদার অ্যালিস্টরের কথা তোমাদের বলা উচিৎ হয় নাই।ব্রাদার তোমাদের উপর রাগিয়াছেন।

ব্যাপারটা আমাদের গা-সহা হয়ে গেলো। রোজ ব্রাদার পকেট ভর্তি জিনিস আনতেন। যার যা হারাতো তিনি দিতেন। শুধু বাদ থাকতাম আমি। এজন্যে আমার ভারি দুঃখ হতো। খুব ভোরে এসে ব্রাদার অ্যালিস্টরের সিঁড়িতে বই খাতা রেখে দূরে অন্যদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম।কি যে ছাই পিয়ানো ভূত! একদিনও আমার বই খাতা ছুঁয়ে দেখলো না।

তবে একদিন পলু দেখে মুখ টিপে হেসে চলে গেলো। কথাটা ক্লাশে গিয়ে সব্বাইকে বলে দিলো।আমি মনিটর বলে কেউ সামনে কিছু বলতো না। তবে আড়ালে মুখ টিপে হাসতো।আমার তখন কি যে লজ্জা!

শেষে আমি এক বুদ্ধি আঁটলাম। আমি হাতে নাতেই প্রমাণ করবো ব্রাদার এলিস্টরের ভূত আমার পেন্সিল নিয়েছে।টিফিনের ঘন্টা বাজতেই হনহন করে চলে গেলাম ব্রাদার অ্যালিস্টরের ঘরের দিকে।

ঘরটা দেখলাম। দরজায় তালা দেয়া, জানালাটাও বন্ধ মনে হলো। কাছে এসে একটু ঠেলতেই জানালা খুলে গেলো।তখন আমার আনন্দ দেখে কে! পকেট থেকে পেন্সিলটা নিয়ে ঘরের ভেতর ছুঁড়ে ফেলতে যাবো তক্ষুণি আমার হাত থেমে গেলো।

হাত থেমে গেলো পিয়ানো ভূতকে দেখে নয়। ঘরের ভিতর তাকিয়ে দেখি এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে পলুর পেন্সিল, জাকি আর মন্টির খাতা, রোজারিওর রাবার, আরও কত কি!

আমি অবাক হয়ে গেলাম।তাই তো বলি পিয়ানো ভূত এদ্দিন পর আমাদের ঘাড়ে কেন চাপলো!

ক্লাশে গিয়ে কাউকে কিছু বললাম না। ঘন্টা বাজার পর ব্রাদার হার্ডি ক্লাশে এলেন। রোজকার মতো বললেন, কার কী হারাইয়াছে দাঁড়াও।

পেছনে কারা যেন দাঁড়াতে যাচ্ছিলো–আমি তড়াক করে দাঁড়িয়ে বললাম, আর কোন জিনিস হারাবে না ব্রাদার।চোর ধরা পড়েছে।জিনিসও পাওয়া গেছে।

ব্রাদারের গোল মুখটা আরো গোল হয়ে গেলো।বললেন, কাছে আইস।

আমি ব্রাদারের কাছে গেলাম।ব্রাদার বললেন, জিনিস কোথায়?

আমি বললাম, ব্রাদার অ্যালিস্টরের ঘরে।

ব্রাদার আরো অবাক হয়ে বললেন, কীভাবে গেলো সেইখানে?

আমি বললাম, সবাই জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে যে।

ব্রাদার গলা নামিয়ে বললেন, তুমি কীভাবে বুঝিলে?

লজ্জায় লাল হয়ে চুপি চুপি বললাম, আমি যে আজ পেন্সিলটা ওভাবে ফেলতে গিয়েছিলাম!

বেনুর সুখ দুঃখ

বংশাই নদীর ওপরে ধু ধু করে রূপোলি বালির চর।এপারে কুমোর পাড়া।এক চিলতে এই নদী নাকি আগে অনেক বড় ছিলো॥দূর দূর থেকে বজরা আসতো, পশরা সাজিয়ে নিয়ে যেতো। বেনুর দিদিমা রাতে মাটির পিদিম জ্বালিয়ে নদীর কথা বলতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে–আহারে নদী।কি নদী আছিল, কি হইয়া গেলো! হায় কপাল! রাতের বারো বছরের বেনু স্বপ্নের ভেতর পাল উড়িয়ে বিশাল বংশাই নদীতে ঘুরে বেড়ায়।

কুয়াশাভেজা ধলপহরে বেনু এসে নদীর তীরে কাশফুলের ঝোঁপের নিচে বসে। তির তির করে বয়ে চলে রূপোলি নদীর ছোট ছোট ঢেউ।শীতের শেষে নদী এতো ছোট হয়ে যায় যে ছোট নৌকোও চলতে পারে না।বেনু তখন হেঁটেই নদী পার হয়।বেনুর বাবা আর পাড়ার সবাই মাটি আনার জন্যে নদীর ওপারে যায়। বেনু কখনো বাবার কাঁধে চড়ে, কখনো বুজলে বাবার হাত ধরে নদী পার হয়।

কুয়াশার ভেতর রূপোলি চরে সূর্য ওঠা বেনুর কাছে কোনোদিনই এক রকম মনে হয় না। তাই বেনু রোজ এসে কুয়াশার চাঁদরের নিচে আস্ত মুশুরির ডালের মতো লাল সূর্যটাকে অনেকক্ষণ দেখে। নদীর তীরে একটা দুটো বক মাছ ধরার জন্যে উদাস ভঙ্গিতে বসে থাকে। মাঝে মাঝে বকের আড়চোখে তাকানো দেখে বেনু হাসে। দাঁত মাজার নিমের ছোট্ট দাঁতন।দিয়ে বালির বুকে বকের একটা ছবি এঁকে ফেলে।ছবি আর মনের মতো হয় না।বেনু বার বার শুধু ছবি আঁকে।একটা বকের ছবি অনেকগুলো হয়ে যায়।

কখনো বেনু নদীতে ছোট ছোট মৌরলা মাছের খেলা দেখে।কাকের চোখের মতো টল টল করে নদী। মৌরলা মাছের দল ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। বেনু যেই নদীতে হাত ছোঁয়ায় তখনই মাছগুলো ছুটে পালিয়ে যায়। বেনু হেসে ফেলে। মুখ দিয়ে ফোয়ারা ছুটিয়ে রঙধনু দেখে।কুয়াশার চাঁদরের নিচে সূর্য তখন অনেক ওপরে উঠে এসেছে।

মা দূর থেকে বার বার ডাকে, বেনু, বেনু।বেনু শুধু হাসে।এক সময় ব্যস্ত হয়ে বাড়ির পথে পা বাড়ায়।

বাবা চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে বলে, মেলার আর বেশি দেরি নাইরে বেনু।অখনো তোর পুতুলগুলা হইলো না?

বেনু হেসে বলে, হইয়া যাইবো বাবা।ভয় পাও ক্যান?

বাবা দিনরাত কাজ করে। মেলায় অনেক জিনিস নিতে হবে। সারা বছরে এ রকম বিক্রির সুযোগ দু তিন বারের বেশি আসে না।নিপুণ হাতে বাবা ফুলদানি বানায়।ছোট ছোট কলসি আর মাটির টব বানায়। মা ফুলদানি আর কলসিতে এলা মাটি, পুঁতের গুঁড়ো, নীলের গুঁড়ো আর সিঁদুর দিয়ে ফুল, লতা-পাতা-এসব আঁকে। দিদিমা তেঁতুল বিচি গুঁড়ো করে চমৎকার পালিশ তৈরি করে।লক্ষ্মী যখন এগুলো রোদে শুকোতে দেয় তখন ঝক ঝক করে যেন হাসতে থাকে।

বেনু শুধু পুতুল বানায়।সবাই বলে দেখ, একরত্তি ছেলে কি চমৎকার পুতুল বানিয়েছে। বাবার মুখটা তখন হাসিতে ভরে যায়।বাবা চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে আবার বলে, বেনু দেরি করিস না।কাম শুরু কইরা দে।

আঙিনার এক কোণে ঘষাচন্দনের মতো নরম মাটি স্তূপ হয়ে পড়ে আছে।বেনু।পুতুল বানাতে বসে।অনেক রকম ছাঁচ আছে পুতুলের।ছাঁচের পুতুল তো সবাই বানায়।বেনু ছাঁচ থেকে পুতুল বের করে পুতুলের গায়ে আরো কিছু কাজ করে। পছন্দ মতো অলংকার পরায়। শাড়ির আঁচলে নকশা কাটে। দেখতে দেখতে ওর পুতুলগুলো অন্যরকম হয়ে যায়।

বেনু দুটো পুতুলকে বর-কনে বানায়।লক্ষ্মী পাশে বসে সব দেখে।তার চোখ দুটো গোল হয়ে যায়।বলে, দাদা, এ পুতুল দুইটা আমারে দিবি?

বেনু মাথা নাড়ে—না! এগুলো আমি বেশি দামে বেচুম।

লক্ষ্মী মুখ কালো করে গাল ফুলিয়ে উঠে যায়।বেনু হাসে।মনে মনে বলে—এগুলা বেইচা তোরে বেলুন কিনা দিমু।আর আমার জইন্য নতুন বই।

বেতন দিতে পারেনি বলে স্কুলে বেনুর নাম কেটে দিয়েছে।বাবা বলে, ঘরে বসে পড়। ঘরে বসে পড়তে গেলে বই তো দরকার।বেনুর সেই বইও নেই।বেনু পুতুল বানাতে বানাতে নতুন বইয়ের স্বপ্ন দেখে।

পৌষের মেলাটা অনেক বড় হয়।দূর থেকে লোকজন মেলা দেখতে আসে।সার্কাসের তাঁবু পড়ে।মৃত্যুকূপের খেলা দেখানোর লোকজন আসে।শহর থেকে আসে সিনেমা দেখানোর কোম্পানি। তাছাড়া, সঙ, নাচ, জারী গান, পুতুলনাচ, যাত্রা এসব তো আছেই।উৎসবের হাট সাতদিন ধরে চলতে থাকে।

এবার মেলায় জায়গার খাজনা বড়ো বেশি চেয়েছে।বেনুরা তাই ঘর তুলতে পারেনি। খোলা আকাশের নিচে ঘাসের ওপর ওরা মাটির পসরা সাজিয়ে বসেছে।পাশে প্লস্টিক আর সিরামিকঅলাদের মস্তো বড়ো দোকান।কাঁচের আলমারির ভেতর রঙ চঙে পুতুল, খেলনা আর চিনেমাটির জিনিসপত্র সারাক্ষণ হাসতে থাকে। রাতেও সেই দোকানে দিনের আলো থাকে। সন্ধ্যেবেলা নিজেদের দোকানে হারিকেন জ্বালিয়ে বেনু প্লাস্টিক আর সিরামিকের উজ্জ্বল আলোর নিচে রাখা সেইসব জিনিসপত্র দেখে ।

বেনুর চোখে পলক পড়ে না।বুকের ভেতর সির সির করে।নিজের পুতুলগুলোর দিকে তাকিয়ে কান্না পায়।সবাই ওদের জিনিস কিনছে।সুন্দর পোষাক পরা সেই মানুষগুলো বেনুদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।হারিকেনের আলোয় নিজের

পুতুলগুলোকে বড় বেশি ম্লান মনে হয় বেনুর।বর কনে পুতুল দুটোর মুখটা কি রকম গম্ভীর দেখাচ্ছে।অথচ বানাবার সময় এরকম মনে হয়নি।

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, যা, মেলা দেইখা আয় বেনু।কাইল তো সময় পাবি না।

বেনু ঘুরে ঘুরে মেলা দেখে। রং-উঠে যাওয়া ময়লা কাপড় পরে একটা লিকলিকে জোকার সার্কাসের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে তোক হাসানোর কি চেষ্টাটাই না করছে! লোকটার জন্যে বেনুর দুঃখ হয়। বেনু সকালে দেখেছে, চার আনা পয়সা চুরি করে তেলেভাজা খাবার জন্যে সার্কাসের ম্যানেজার ওকে বেত দিয়ে পিটিয়েছে। নাকটা এমনই ফুলেছে যে ওকে বাড়তি নাক লাগাতে হয়নি।ফুলোটাকে শুধু রং করে দিয়েছে, যাতে মনে হয় ওটা আসলে বুঝি নকল।

বেনু নাগরদোলার সামনে এসে দাঁড়ায়। সুন্দর জামা-কাপড় পরা ছেলেমেয়েরা নাগরদোলায় ঘুরছে, শব্দ করে হাসছে, চিৎকার করছে।নাগরদোলার লোকটা বেনুকে বলে, কি খোকা উঠবে?

বেনু মৃদু হেসে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়। বেনুর পাশে একটা বেলুনঅয়ালা দাঁড়িয়েছিলো।সে বলে, তুমি আমার বেলুনগুলা ধরবা? আমি একটু উঠুম।

ছেলেটা বেনুদের চেয়ে বয়সে বড়ো হবে। বেনু ওর বেলুনগুলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।ভাবে এতগুলো বেলুন যদি লক্ষ্মী পেতো! একবার মনে হয় নাগরদোলা জোরে ঘোরার এই ফাঁকে ও যদি বেলুনগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়।সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হয়, আহা বেচারা, বেলুন বিক্রি করেইতো ও বেঁচে আছে।বেলুনগুলো হারিয়ে ফেললে ওকে সেই লিকলিকে জোকারটার মতোই হয়তো মার খেতে হবে।বেনু শক্ত করে বেলুনের সুতোগুলো চেপে ধরে।এক সময় ওর মনে হয়, নাগরদোলায় কেউ বসে নেই।শুধু ও আর লক্ষ্মী দুজন ঘুরছে। লক্ষ্মীর হাতে বর-কনে পুতুল দুটো। চারপাশে অনেক রঙ বেরঙের বেলুন উড়ছে।

ছেলেটা এসে বেনুকে বলে, দাও ভাই, বেলুনগুলা দাও।

বেনু চমকে উঠে ওর দিকে তাকায়। তারপর বেলুনগুলো বাড়িয়ে দেয়। ছেলেটা বেলুনগুলো হাতে নিয়ে কি যেন ভাবে।তারপর বলে, তুমি একটা বেলুন নিবা?

বেনু মৃদু হেসে মাথা নাড়ে।ছেলেটা একটু অবাক হয়ে চলে যায়।বেনু মনে মনে বলে– বোকা, আমারে বেলুন দিয়া তুমি যদি পিটুনি খাও!

পরদিন সন্ধ্যেবেলা গরুর গাড়িতে জিনিসপত্র বোঝাই করে বেনুরা আবার ওদের গ্রামের পথে পা বাড়ায়।বেনুর পুতুলের ঝুড়িটা ওর হাতে।একটা পুতুলও বিক্রি হয়নি। বেনুর সামনে ওর বাবা আর নিতাই দাদু হাঁটছে।বাবা এক সময় নিতাই দাদুকে বলে, এ রকম হইলে তো আর বাচন লাগব না খুড়া।

নিতাই দাদু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলে, কবে যে ভিটেমাটি থেইকা উচ্ছেদ হই কে জানে।বন্ধকের মেয়াদ তো কবেই ফুরাইয়া গেছে।

বাবা বলে, আমারও তো একই দশা।

নিতাই দাদু বলে, খালি তোর ক্যান, আমাগো সকলের অবস্থাই এক রকম।উপাসের জ্বালায় বিন্তির বাপ মা সেদিন গলায় দড়ি দিলো।

বাবা কী যেন ভাবে। একটু পরে বলে, তোমারে তো সিরামিক কারখানা থেইকা ডাকছিলো।যাইবা?

নিতাই দাদু একটু তেতো হেসে বলে, নারে বাপ, যে কদিন আছি, নিজেগো কামটারে বাঁচাইয়া রাখার চেষ্টা রকুম।

সব কথা বেনুর কানে যায় না।বেনু জানে ওর বাবাও কোনদিন প্লাস্টিক বা সিরামিকের কারখানায় কাজ করতে যাবে না। দিদিমা বলে মোগল বাদশারা আমাগোর কদর করতো।আমাগোর কাম কি এতই ঠুনকা!

বেনুদের ঘরের মাটির দেয়াল প্রায় ধ্বসে পড়েছে। বৃষ্টি হলে ঘর ভেসে যায়। কুমোরপাড়ায় একটা ঘরও আস্ত দাঁড়িয়ে নেই।তবু কেউ বাইরে কাজ করতে যাবে না। এতো দুঃখ বেনুর ভালো লাগে না।

বংশাই নদীর চরে সূর্য ডুবছে।বাতাসে চরের বালিতে ছোট ছোট রূপালি ঘূর্ণি তৈরি হয়। বেনু দূর থেকে লক্ষ্মীকে দেখে।

লক্ষ্মী বেনুকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়।বেনু ওকে পুতুল দেয়নি বলে ওর দুঃখও কম নয়।বেনু মুখ টিপে হেসে বলে, লক্ষ্মী, তোর লাইগা কি আনছি দ্যাখ।

লক্ষ্মী অভিমান ভুলে বেনুর দিকে তাকায়।বেনুর হাতে পুতুলের ঝুড়ি দেখে অবাক হয়। বলে, এগুলা তুমি বিক্রি কর নাই দাদা?

বেনু ঝুড়ির ভেতর থেকে বর-কনে পুতুল দুটো বের করে।লক্ষ্মীর মুখে হাসি ফোটে। বেনু বলে, এগুলা তোর!

লক্ষ্মী ছুটে এসে পুতুল দুটো নিয়ে বুকে চেপে ধরে।ওর চোখ দুটো খুশিতে চকচক করে।

বেনু হাসে।হাসতে হাসতে অবাক হয়ে দেখে বর-কনে পুতুল দুটোর মুখ মোটেই গম্ভীর নয় নয়, দিব্যি হাসি-খুশি মুখ, ঠিক লক্ষ্মীর মতো।

দূরে মন্দিরে পূজার ঘন্টা বাজে।লক্ষ্মী হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে আঙুল তুলে বলে, দেখ দাদা, দেখ!'

বেনু চেয়ে দেখে এক ঝাক বক চমৎকার সারি বেঁধে উড়ে যাচ্ছে।এই বকগুলোর ছবিই সকালে সে এঁকেছিলো।বেনুর মনে হয় বকগুলো যেন ওর বুকের ভেতর থেকে উড়ে গেছে।

রাজুর পৃথিবী

রাজুর চোখের সামনে ওর চেনা মানুষগুলো দিন দিন কেমন যেন বদলে যেতে লাগলো। বাবা আজকাল রাত করে বাড়ি ফেরেন।আপিসে নাকি কাজের চাপ পড়েছে।তার ওপর ছুটির পর দুটো টিউশনিও করতে হয়।ভাইয়া ভার্সিটি যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।বাবা বলে দিয়েছেন, পড়ে আর কাজ নেই। তার চেয়ে কোথাও একটা চাকরি জোটাতে পারলে সংসারের কাজে লাগবে। মেজো ভাইও আর কলেজে যায় না। বাবা বলেন মেজো ভাই নাকি পলিটিক্স করে।আর ওই করেই ও গোল্লায় গেছে।ওকে দিয়ে কিছু হবে না।

ভাইয়া আর মেজো ভাইকে বাবা যখন তখন শুয়োরের বাচ্চা আর কুত্তার বাচ্চা বলে গালি দেন।আজকাল বাবা মাকেও বকেন।রাজুর এসব ভালো লাগে না।শরীর খারাপ বলে।সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকে।শুধু কান্নার মতো কিছু যেন বুকের ভেতর গুমরে মরে।

অথচ রাজু দু'বছর আগে যুদ্ধের দিনগুলোতে বাবাকে দেখেছে, ভাইয়া আর মেজো ভাইর কথা বলতে গিয়ে আনন্দ আর গর্বে কি রকম ফেটে পড়তেন।ওরা দু'জনই যুদ্ধে গিয়েছিলো। নিয়মিত না হলেও বাবা ওদের খবর পেতেন। কখনো চিঠি আসতো, কখনো কারো মুখে শুনতেন, কখনো বা রাতের অন্ধকারে মেজো ভাই হঠাৎ করে হাজির হতেন। বাবা মাকে বলতেন, হবে না কেন বলো! আমার দাদা একবার এক সাদা চামড়ার সায়েবকে চড় মেরে একশ টাকা জরিমানা দিয়েছিলেন।আমার বাবা বিএ পাস করেও বৃটিশদের চাকরি করেননি।ছোট কাকা বোমা বানাতে গিয়ে মারা গেলেন। বিদ্রোহ আমাদের রক্তের কণায় কণায় মিশে আছে। খোকন আর মনি যদি যুদ্ধে না যেতো তাহলেই আমি অবাক হতাম।

যুদ্ধের ন' মাস রাজুরা গ্রামের বাড়িতে ছিলো। দক্ষিণে ভাটির দেশে রাজুদের গ্রাম। শত্রুরা ওদিকে যেতে সাহস পেতো না।বাবা তখন মাকে শুধু বলতেন, চলো আমরাও ফ্রন্টে চলে যাই।খোকনদের ক্যাম্পে কাজের অভাব হবে না। মা রাজী হননি।গ্রামের বাড়ির জন্যে মা'র বড়ো বেশি রকম টান ছিলো। অসহযোগের দিনগুলোতে বাবাকে দেখে রাজুর মনে হতো—তার বুকের ভেতর বিদ্রোহ যেন আগুনের মতো দাউ দাউ করে জ্বলছে।

সেই বাবা একদিন রাতে খাবার টেবিলে বসে পলিটিক্স করা নিয়ে মেজো ভাইকে যা-তা বললেন।ভাইয়াকে বললেন, তোর লজ্জাও করে না এখনো একটা চাকরি জোটাতে পারিসনি? তোরা যুদ্ধ করেছিস না আমার মাথা করেছিস।যারা যুদ্ধ করেছে।তারা ঠিকই এদ্দিনে সব গুছিয়ে নিয়েছে।

ভাইয়া বললো, সবাই নয় বাবা, কেউ কেউ নিয়েছে।আপনি কি আমাদের হাইজ্যাকার হতে বলছেন?

মেজো ভাই হেসে বললো, আমরা হাইজ্যাকার হবার জন্যে যুদ্ধ করিনি বাবা।

বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, চোপ হারামজাদা! মুরোদ নেই এক ছটাক, তার ওপর লম্বা কথা! ওরে শুয়োরের দল, হাইজ্যাকার হতে গেলেও মুরোদ থাকতে হয়!

পাশের ঘর থেকে মা চাপা গলায় বললেন, আক্কেল বুদ্ধি কি লোপ পেয়েছে নাকি! ছেলেদের যতো বাজে কথা শোনানো হচ্ছে!

বাবা চড়া গলায় মাকে ধমক দিলেন, আমার কথার ভেতর নাক গলানো আমি পছন্দ করি না।তারপর বাবা কাশতে শুরু করলেন।ভাইয়া আর মেজো ভাইকে সামনে থেকে সরে যেতে ইশারা করলেন মা।

রাজু লক্ষ্য করেছে বাবা দিন দিন বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন।শেষ রাতে বাবার কাশির শব্দে ওর ঘুম ভেঙে যায়।জানালার বাইরে কামিনী গাছের নিচে তখনো জমাট অন্ধকার। কাশতে কাশতে বাবার দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। বাবার বয়স এখনো পঞ্চাশ পেরোয়নি।অথচ ভেজাল বলে বাবা ওষুধ খাবেন না।রাজু জানে ওষুধের অনেক দাম।

মেজো ভাই প্রায় রাতেই বাড়ি ফেরে না।মা যদি কিছু বলেন, বাবা অমনি ধমক দিয়ে বলবেন জাহান্নামে গেছে।খবর্দার ওদের কোনো কথা আমাকে বলবে না।

কখনো মা মেজো ভাইকে বকতে বকতে কেঁদে ফেলেন।বলেন, পলিটিক্স আমাদের জন্যে নয়।যাদের খাওয়া পরার কোনো অভাব নেই ওরাই ওসব করে।আমাদের তো খেয়ে বাঁচতে হবে।ওসব নিয়ে ভাবার সময় কোথায়?

মার কথা শুনে মেজো ভাই শুধু হাসে।বলে, তুমি যেভাবে বেঁচে আছো এটাকে বাঁচা বলে না মা।আমরা চাই সবাই ভালোভাবে বাঁচবে।

মা তবু কাঁদেন।কখনো পাড়ার কোন মহিলাকে বলেন, তিন বেলা রুটি খেয়ে কখনো কি থাকা যায়! উনি রুটি সহ্য করতে পারেন না, আমি মুখ দেখেই বুঝি।বলি এক বেলাইতো বাড়িতে খাও।দুটো ভাত খেলে কী হয়! আমরা না হয় রুটি খেলাম।উনি বলেন, কেরোসিন খুব সস্তা হয়ে গেছে নাকি! ভাত রুটি এতো কিছুর জোগান দেয়া যাবে না।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাজু ভাবে, দুই কামরার অন্ধকার স্যাঁতসেতে এই বাড়িটাকে যদি হঠাৎ একটা ঝড় এসে উড়িয়ে নিয়ে যায় তাহলে বেশ হয়।ওর ইচ্ছে করে বহু দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে। রাজুদের গ্রামের বাড়ি সমুদ্রের কাছে। যখন ওরা গ্রামের বাড়িতে ছিলো, তখন গভীর রাতে রাজু সমুদ্রের গর্জন শুনতো।নারকেল আর সুপুরি গাছের ভেতর দিয়ে হু হু করে ভেসে আসতো সমুদ্রের সতেজ বাতাস।রাজুকে তখন কেউ সমুদ্রের তীরে নিয়ে যায়নি।

রাজু আজও সমুদ্র দেখেনি।দম বন্ধ করা বাড়িটার এক স্যাঁতসেতে কামরায় শুয়ে রাজু তার বুকের ভেতর সমুদ্রের গর্জন শোনে।

ঠিক এভাবেই রাজু মেজো ভাইর চোখে সমুদ্রের ছায়া দেখে।মেজো ভাই রাজুকে বলে, পৃথিবীটা অনেক বড়ো রাজু।এই বাড়িটা ছেড়ে, এই গলিটা ছেড়ে, এই শহরটা ছেড়ে বুকে সাহস নিয়ে বেরিয়ে পড়।দেখবি জীবনের পরিধি অনেক বড়ো হয়ে গেছে।

মেজো ভায়ের সব কথা রাজুর কাছে স্পষ্ট নয়। অনেকটা শেষ রাতের কুয়াশা ঢাকা সমুদ্রের মতো।সবটুকু বোঝা যায় না।তবু বোঝা যায়।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা মেজো ভাই হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলো।বাবার শরীর ভালো নয় বলে দুপুরে আপিস থেকে চলে এসেছেন। মেজো ভাই ব্যস্ত গলায় বাবাকে বললো, এক্ষুণি একবার হাসপাতালে যেতে হবে বাবা।

মা আর্তনাদ করে উঠলেন–কেন?

মেজো ভাই তেমনি ব্যস্ত গলায় বললো, ভাইয়া অ্যাকসিডেন্ট করেছে।

বাবা মা দু'জনই মেজো ভাইর সঙ্গে হাসপাতালে গেলেন। রাজু অন্ধকার ঘরে একা শুয়ে রইলো।দু'মাস ভাড়া বাকি পড়েছে বলে বাড়িওয়ালা ইলেকট্রিকের লাইন কেটে দিয়েছে।

নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হলো রাজুর।একবার মনে হলো কেউ যেন ওকে এক্ষুণি এসে বলবে, জলদি হাসপাতালে চলো রাজু। তোমার বাবা, মা, মেজো ভাই সবাই অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন।

অনেক রাতে বাবা আর মা বাড়ি ফিরলেন।রাজু শুয়েছিলো।ওর বুকের ভেতর কান্নার সমুদ্র জমছিলো। রাজু তখন সমুদ্রের গর্জন শুনছিলো। বাবা অন্ধকারে বারান্দায় বসে রইলেন।মা বিছানায় উপুড় হয়ে সারারাত কাঁদলেন ।

সকাল থেকে পাড়ার লোকজন আসতে শুরু করলো ওদের বাড়িতে। সন্ধ্যেবেলা। মেজোভাই ভাইয়ার লাশ নিয়ে ফিরলো।রাজু শুনলো, ভাইয়াকে হাইজ্যাকার মনে করে রাস্তায় পিটিয়ে মারা হয়েছে।

খুব ছোট বেলায় রাজুর মনে আছে ভাইয়া পাড়ার ছেলেদের নিয়ে দেয়াল পত্রিকা বের করতো।লাজুক হেসে মেজো ভাইকে ডেকে বলতো, মনি, শোন একটা কবিতা লিখেছি। বিকেলে ভাইয়া লিনা আপার সঙ্গে পার্কের রাধাচূড়ড়া গাছটার নিচে বসে গল্প করতো। রাজু অবাক হয়ে ভাবলো, চোখে পুরু লেন্সের চশমা, খদ্দরের ঢোলা পায়জামা পাঞ্জাবি আর স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরে ভাইয়া কি করে হাইজ্যাকার হয়েছিলো।

ভাইয়াকে কবর দিয়ে এসে বাবা আরো বুড়ো হয়ে গেলেন। তার বুকের অসুখ বেড়ে গেলো।আরো বদমেজাজী হলেন।একদিন মাকে পর্যন্ত চড় মারলেন।

মা শুধু কাঁদেন। নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দেন। আর মেজো ভাই আরো ব্যস্ত হয়ে উঠলো।রাতে বাড়ি ফেরা আরো কমিয়ে দিলো।

রাজু ভাবে পুরোনো শহরের এই বন্ধ গলির অন্ধকার বাড়িটা থেকে সমুদ্র কি অনেক দূরে? আজকাল ওর শুধু সমুদ্রের গর্জন শুনতে ইচ্ছে করে।

মেজো ভাই যখন আসে তখন মনে হয় বাড়িতে এক ঝলক সমুদ্রের তাজা বাতাস ঢুকলো।একদিন মেজো ভাই রাজুকে বললো, চল রাজু, বেরিয়ে পড়ি।অনেক দূরে চলে

যাই। আমরা সমুদ্রের তীরে সেই গ্রামে যাবো। একটু থেমে মেজো ভাই আপন মনে বললো, গ্রামগুলো সব ভেঙে যাচ্ছে।

রাজু ভয় পেলো—গ্রাম কেন ভেঙে যাচ্ছে মেজো ভাই?

মেজো ভাই একটু হাসলো। বললো, গ্রামের মানুষের কোনো সুখ নেই। ভাবছে শহরে এসে সুখে থাকবে। তাই গ্রাম উজাড় করে সব শহরে চলে আসছে। এসে ভিখিরির মতো শহরের দরজায় ঘুরছে। শহরে এসে গ্রামের তেজী মানুষগুলো অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে।

কথা বলতে বলতে মেজো ভাই যেন সমুদ্রের তীরে হেঁটে বেড়ান। রাজু সমুদ্রের শোঁ শোঁ গর্জন শোনে। ঢেউগুলো বুকে এসে ভেঙে পড়ে।

তারপর একদিন বাবার চাকরি চলে গেলো। বহুদিন পর হাসতে হাসতে বাবা বাড়ি ফিরলেন। মাকে বললেন, তোমাকে বলেছিলাম না, গেল মাসে আপিসের বড়ো সায়েবের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম। আজ বললো, আমার বিরুদ্ধে নাকি দালালীর অভিযোগ আছে। বলে বাবা হাসিতে ডুবে গেলেন। বললেন, অনেকগুলো ঘটনা আমরা একটু দেরিতে বুঝি। হাসতে হাসতে হঠাৎ তাঁর কাশি উঠলো। বাবা অতি কষ্টে কাশি চেপে বললেন, ভালোই হলো। আসলে চাকরি করা আমাদের ধাতে সয় না।

রাজুর মনে হলো তার চেনা পৃথিবীটা যেন আরো ছোট হয়ে আসছে। বাবার দাদা এক সায়েবকে চড় মেরেছিলেন, তাঁর বাবা বি এ পাশ করেও বৃটিশের চাকরি করেননি। তাঁর কাকা বোমা বানাতে গিয়ে মারা গেছেন। বাবা বলেন, ওদের রক্তে নাকি বিদ্রোহের বিষ রয়েছে। কেউ কোথাও সুস্থির হয়ে বসতে পারে না। ওদের কেউ নিয়মের ছকে পা

ফেলে চলতে শেখেনি।

ভাইয়া কবিতা ভালোবাসতো বলে ওকে সবাই এক ব্যস্ত বিকেলে খোলা রাস্তায় পিটিয়ে মেরে ফেললো। মেজো ভাই দিনে বাড়ি ফিরতে ভয় পায়। মা অবিরাম কাঁদেন। আর বাবা সব জেনে, শুনে, বুঝে, হাসতে হাসতে বলেন ভালোই হলো।

বহুদিন হলো রাজু ইশকুলে যায় না। বেতন দিতে পারেনি বলে নাম কাটা গেছে। বাবা বলেন, জানা আছে ইশকুলে কেমন পড়া হয়।

রাজুর মনে আছে, সন্ধ্যেবেলা ইশকুলের গির্জায় ঘন্টা বাজাতো। আশ্চর্য এক বিষণ্ণতায় ঘন্টাগুলো থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বাতাসে হারিয়ে যেতো। অদ্ভুত সেই শব্দ রাজুকে সমুদ্রের তীরে নিয়ে যেতে চাইতো।

গভীর রাতে বহুদূরে গির্জার সেই ঘন্টা শুনতে পায় রাজু। পাশের ঘরে বাবা মাকে গুণগুণ করে বলছিলেন, চলো, গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাই। আর তো শহরে থাকার কোনো মানে হয় না। মাঝে মাঝে এসে ছেলেটার কবর দেখে যাবো।

গির্জার ঘড়িতে ঘন্টা বাজতেই থাকে। বাবার গলার স্বর ঘন্টার সেই গভীর শব্দের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়। এক দুই করে রাজু ঘন্টাগুলো গোণার চেষ্টা করে।

তারপর একসময় সেই ঘন্টার শব্দ রাজুকে সমুদ্রের তীরে নিয়ে যায়।আকাশে তখন রঙ ধরেছে।নারকেল আর সুপুরির বনে শোঁ শোঁ সমুদ্রের বাতাস।

মেজো ভায়ের হাত ধরে রাজু উদ্দাম এক সমুদ্রের তীর ধরে হেঁটে চলে দূরে, আরো দূরে।

লাল সূর্য

গলিটা তখন আধো অন্ধকার। দু'পাশের নোনাধরা দেয়াল থেকে ভ্যাপসা গুমোট দম বন্ধ করা গন্ধ বেরুচ্ছে। আকাশটা কুয়াশার চাঁদরে মোড়া। ককনে বাতাস বইছে থেকে থেকে।

পুরোনো রঙওঠা দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে ফেললো শমি। বিশ্রি রকম শব্দ করে যেন প্রতিবাদ জানাতে চাইলো দরজাটা। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করে ভেতরে ঢুকলো। বেরিয়ে এলো শমি। দরজাটা শেষবারের মতো বন্ধ করে দিলো।

তখনো সূর্য ওঠেনি। পূবের আকাশে রঙ ধরেছে শুধু। রমনার কুয়াশা ভেজা কালো পথে হাঁটতে হাঁটতে ভাবলো শমি—আমি আজ প্রাণভরে সূর্য দেখবো।

পূব আকাশের লালটা আস্তে আস্তে চোখ ঝলসে দিলো । রমনার সবুজ গাছের ফাঁকে সূর্যকে উঠতে দেখলো শমি। কি সুন্দর সূর্য ওঠা! এত লাল এর আগে কখনো দেখেনি সে। পাখিরা ডাকছে। লাল গোলাপের পাপড়ির ওপর শিশির বিন্দুতে সূর্যের ছায়া পড়েছে। দূরে গির্জার ঘন্টা বাজলো। এক দুই তিন চার করে ঘন্টাগুলো গুনলো শমি।

শমির দীর্ঘ ছায়া ধীরে ধীরে ছোট হচ্ছে। পশ্চিমমুখো হয়ে রমনার ঘোড়দৌড়ের মাঠের ভেতর অনেকক্ষণ হাঁটলো শমি। ইশকুলে ও আজ যাবে না। হয়তো কোনোদিন আর ইশকুলে যাওয়া হবে না।

হাঁটতে হাঁটতে শমি ভাবলো আমি বাড়ি ফিরবো না। সারাদিন ঘুরবো। ইশকুলে এতক্ষণে ক্লাশ শুরু হয়েছে। হলেই বা কি। ইশকুলে শমির কোনো বন্ধু নেই। ভালো লাগে শুধু ফাদার পিটারকে। ফাদার পিটার কখনো ওকে ডেকে আদর করে পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। একদিন পেন্সিল হারিয়ে ভয়ে কেঁদেছিলো বলে ফাদার ওকে সুন্দর একটা পেন্সিল দিয়েছিলেন।

এখন ঠিক ফাদার পিটারের ক্লাশ হচ্ছে। কত গল্প যে জানেন ফাদার। সারাক্ষণ বাইবেল থেকে গল্প শোনাবেন। ভাবতে শমির খুব ভালো লাগলো। যীশুখ্রীস্টকে কাটার মুকুট পরিয়ে সে পেরেক ঠুকে রাখার কথা বলতে গিয়ে ফাদার পিটার কখনো কেঁদে ফেলেন। বলেন : পৃথিবীর সকল বেদনাকে নিজের করিয়া লইবার জন্যে প্রভু ক্রুসে গিয়াছেন। ফাদার পিটার বুকে ক্রুস আঁকেন ..... প্রভুকে যখন বলা হলো : কুয়ো ভাদিস ডোমিনি? কোথায় চলেছে প্রভু? তখন প্রভু বলেছিলেন, টু রোম, টু বি কুসি ফাঁইড এগেইন। প্রভু চাইতেন পৃথিবীতে আর যেন কষ্ট না থাকে।

বার বার ফাদার পিটার কুয়ো ভাদিস-এর গল্পটা বলতেন। শমি ভাবলো—আজও কি ফাদার সেই গল্প বলছেন?

শহরের কোলাহল শুনলো শমি। দূরে মিছিল যাচ্ছে। ওদের সবার হাতে প্ল্যাকার্ড। ওরা সবাই ছাত্র। শমি ভাবলো আমিও প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিলে সবার সাথে গলা মিলিয়ে কথা

বলবো।শমি একটু উত্তেজিত হলো।এপাশ থেকে লরী বোঝাই রাইফেলঅলা পুলিসরা যাচ্ছে।এরা গুলি ছুঁড়বে নাকি? মিছিল এগিয়ে চলছে।শমি হাঁটছে মিছিলের পেছনে।

ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসটা এখনো বইছে।দূরের কোলাহলটা সহসা অস্বাভাবিক উত্তেজিত আর অশান্ত বলে মনে হলো শমির।মেডিকেল কলেজের সামনে সারি বাঁধা নাম না জানা গাছগুলোর ফাঁকে ধোয়া দেখতে পেলো শমি।বন্দুকের শব্দ হচ্ছে।ওরা কি গুলি ছুঁড়ছে? শমি উত্তেজিত হয়ে ছুটতে শুরু করলো।শেরে বাঙলা-মাজার শরিফ লেখা কালো সাইন বোর্ডটা পেছনে রেখে ছুটলো শমি।

ওদিকে কোথায় যাচ্ছো? শুনছে না গুলি ছোঁড়া হচ্ছে ওখানে, টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ছে ওরা? এসো, পালিয়ে এসো।একজন বুড়ো হন্তদন্ত হয়ে এক বগলে ছাতা আর হাতে স্ত্রাপছেঁড়া স্যান্ডেল জোড়া নিয়ে ছুটতে ছুটতে শমিকে ধমকে দিলেন।

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো শমি।বললো না।আবার ছুটলো ইউনিভার্সিটির মাঠের ভেতরে।

সাঁই সাঁই করে পুলিস বোঝাই ট্রাক আর জিপ ছুটছে।চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগলো। দু'হাতে চোখ কচলাতে কচলাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের গ্যালারির সিঁড়িগুলোর কাছে এসে দাঁড়ালো শমি।

লোকজন সবাই ছুটোছুটি করছে।বাচ্চা কোলে ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরা একটা মেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো।তীব্র স্বরে কেঁদে উঠলো বাচ্চাটা।মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়ে বাচ্চাটার মুখ চেপে ধরে পাশের নালার মধ্যে বসে পড়লো।

শমি পাচিলটার কাছে এগিয়ে গেলো।মাথা তুলে দেখলো একটা বুড়ি চার পাঁচ বছরের একটা ছেলেকে বুকে চেপে উপুড় হয়ে বসে আছে।শমি মাথা নামালো।ছেলেটা বলছিলো, আমার ডর লাগতাছে দাদি।

বুড়ির চাপা গলা শুনলো শমি চুপ, চুপ সোনা, কথা কইস না।কথা কইলে মাইরা হালাইবো তোরে।

ক্যা মারবো? ছেলেটাকে প্রশ্ন করতে শুনলো শমি।

বুড়ি আবার বললো, চুপ যারে সোনা।কথা কইস না।কথা হুনলেই মাইরা হালাইবো।

বুড়ির কথা শুনে চমকে উঠলো শমি।কথা বললেই মেরে ফেলবে? কেন? বন্দুক আর রাইফেল নিয়ে যারা রাস্তায় ছুটোছুটি করছে তারা কি কথাকে ভয় পায়?

বড়দার কথা মনে পড়লো শমির।বাবার কাছে শুনেছে বায়ান্ন সালে ভাষা আন্দোলনে গিয়ে আর ঘরে ফেরেননি বড়দা.।শমি ভাবলো, বড় হয়ে আমি বড়দার মতো হবো।

ছাত্রদের ছুটোছুটি দেখে শমি আবার মাথা তুললো।ওখানে এত লোক কেন? চমকে উঠলো।কী নিচ্ছে ওরা ধরাধরি করে? একটা হাত ঝুলে পড়েছে।শমি দেখলো লাল– অনেক অনেক লাল, সূর্যের মতো লাল তাজা রক্তে ভেজা শরীর।ভয়ে দু'চোখ বন্ধ

করলো শমি। অনেকগুলো রাগী গলায় শ্লোগান শুনলো–শহীদের রক্ত, বৃথা যেতে দেববা না।

একটা লরী আসছে।কে যেন শমির হাত ধরে জোরে টানলো।শমি দেখলো সেই বুড়িটা। বুড়ি বললো, তুমি এই হানে কি কর, বইয়া পড়।দেহ নাই কেমন ছাওলডারে গুলি করছে? তোমারে দেখলে এমুহি আইবো কইলাম।

শমি চলে এলো। আবার গুলির শব্দ হলো। শমি উল্টো দিকে দৌড়ালো। গোটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থম থম করছে।

সারাদিন হাঁটলো শমি।বাড়ি ফেরার ইচ্ছে হলো না।বাড়ি আর কোনোদিন ফিরে যাবে না বলেই তো বেরিয়েছে সে।কাল রাতেও বাড়িতে বকুনি খেয়েছে দেরি করে ফেরার জন্য।মা মরে যাওয়ার পর বাবা যাকে বিয়ে করেছেন সেই নতুন মা দু'চোখে দেখতে পারেন না শমিকে। বার বার শুধু বলেন, আপদ বিদেয় হলেই বাঁচি। বাবা দেখেও দেখেন না, শুনেও শোনেন না।

গত কয়েক বছরে বাবা বড় বেশি বুড়িয়ে গেছেন।সারাদিন অফিস করে সন্ধ্যেয় বাড়ি ফেরেন। একবাটি মুড়ি খেয়ে টিউশনি করতে যান। ফেরেন রাত দশটায়। নতুন মা শমিকে বলেন, ধাড়ি ছেলে ঘরে বসে কাড়ি কাড়ি ভাত গিলতে লজ্জাও হয় না।কবে যে বিদেয় হবে–তবে আমার হাড় জুড়োবে।

শেষ বিকেলে নদীর ধারে হাঁটতে হাঁটতে শমির মনে হলো, যাদের মা নেই তাদের অনেক কষ্ট।মায়ের ওপর রাগ হয় শমির।মা কেন এত তাড়াতাড়ি মরে গেলো?

শমির মা নেই, বাবা থেকেও নেই।শমি কোনোদিন ইশকুলে যায়, কোনোদিন যায় না। ঠিকমতো বেতন দিতে পারে না, টিফিনে কিছু কিনে খেতে পারে না, বাড়ি থেকেও টিফিন আনে না।শমি জানে ক্লাশের ছেলেরা ওকে এড়িয়ে চলতে চায়।ইশকুলে যারা কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে শমি তাই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়।

গত কদিন ধরে শহর খুব গরম।মিছিলের পর মিছিল বেরুচ্ছে।রাতে কারফিউ থাকে। কারফিউ ভেঙে মিছিল বেরোয়।শহীদ মিনারের নীচে দাঁড়িয়ে শপথ নেয়া হয়।মিছিলে গুলিও চালানো হয়, আজ যেমন হয়েছে।

শমি কাল ছাত্রদের মিটিঙে শুনেছে, একজন বক্তৃতা দিচ্ছিলো, আমরা স্বৈরাচার চাই । স্বাধীনতা চাই। আমরা মানুষের মতো বাঁচতে চাই। আমরা না খেয়ে শুকিয়ে, বিনা চিকিৎসায় ধুকে ধুকে মরতে চাই না।আমরা এ সমাজ ভাঙতে চাই।

শমি ভাবে কবে ভাঙবে এই সমাজ? কবে আসবে সেই স্বাধীনতা।সন্ধ্যার আকাশে সূর্য ডুবছে। একটু পরে সব অন্ধকার হয়ে যাবে। ভয় পেলো শামি। আকাশের লাল দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। দূরে শ্লোগান শুনে তাকালো শমি। ছাত্রদের মশাল মিছিল বেরিয়েছে। মশালের আগুন সূর্যের চেয়েও লাল।

শয়তান ও একটি চারাগাছ

লোকটা কি পাগল? কেউ বললো যাদুকর। কেউ মাথা নাড়লো–তিনি একজন সাধুপুরুষ।অথচ তার পোশাক বা চেহারায় কোনোটাই মনে হয় না।পরনে আধময়লা পাঞ্জাবি আর পায়জামা। স্পঞ্জের স্যান্ডেলের একটা ফিতে চামড়া দিয়ে বাঁধা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চুলগুলো রুক্ষ, লালচে বাতাসে এলোমেলো উড়ছিলো।

একজন নেতার মতো লোকটা বক্তৃতার ভঙ্গিতে কী যেন বলছিলো।মঙ্গলবারে বটতলার হাটের শেষে ঘর মুখে হাটুরেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলো। দু'একটা মন্তব্যও করছিলো।যখন লোকটা বললো, একার জন্য যারা বাঁচে তাদের সঙ্গে শেয়াল কুকুরের কোনো পার্থক্য নেই। আমরা যাদের মানুষ বলি তারা বাঁচে সকলের জন্যে। মানুষ নামের গৌরব সেখানেই+তখন সবাই বললো, তিনি নিশ্চয়ই কোনো সাধু পুরুষ। তারপর লোকটা বললো, সারা দেশে এতগুলো মানুষ কেন মরলো একবার কি কেউ ভেবে দেখেছো? তোমরা কি ভেবেছো ওরা স্বাধীনতার জন্যে মরেছে? প্রচণ্ড শব্দে হা হা অট্টহাসি চারপাশের বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে লোকটা বললো, ওরা মরেছে বাঁচার জন্যে। তারপর লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো, এ দুঃখ কোথায় রাখবো বলো, ওরা নিজেরাও বাঁচতে পারলো না।আমাদেরও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে গেলো।আমরা মরছি।মরতে মরতে বেঁচে আছি, মরার দিন গুনছি, ওরা আমাদেরও খুন করে গেলো। আবার কিছুক্ষণ কাঁদলো লোকটা। সবাই বললো, কী আশ্চর্য, লোকটা পাগল নাকি? তখন হঠাৎ লোকটা কান্না থামিয়ে বক্তৃতায় ঢংয়ে বললো, তোমরা কি জানো একটা লোক দুটো লোক হতে পারে? একটা শয়তান ঈশ্বরের মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ায়। তার সাঙ্গ পাঙ্গরা পরে দেবদূতের মুখোশ, আর অন্ধ তোমরা তাদের পবিত্র জেনে মুগ্ধ হয়ে পূজো করো। এটা এক ভয়ঙ্কর সত্য কথা, আসলে আমিও জানি না আমি কে? তবে আজ আমি তোমাদের ছোট্ট এক চারাগাছ দিয়ে যাবো। এই গাছ একদিন বিশাল মহীরুহে পরিণত হবে।তার আগে এর মাহাত্ম শোনো।সবাই বললো, তাই বলো, তুমি একজন যাদুকর।

তখন সন্ধ্যে নেমেছিলো।সূর্য ডুবে গেছে, তবু সারা আকাশে রঙের ছটা।লাল, গোলাপি আর কমলা রঙের আকাশ। সবার তখন বাড়ি ফেরার কথা মনে হলো। কারণ সবাই বুঝে গেছে লোকটা আসলে এক ভেল্কিবাজ।কোথাকার কোন জংলী চারা বেচে পয়সা মারবার তালে আছে।একজন ভয়ে ভয়ে বলে ফেললো, যাদু যদি জানে তাহলে আরো বিপদ। আমাদের পয়সাগুলোও মন্ত্র পড়ে নিজের ঝোলায় চালান করে দেবে। যাদুকরদের বিশ্বাস নেই।

শুনে লোকটা হা হা করে হাসলো।হাসতে হাসতে বললো, ভয় নেই।আমি সে নই।যাদু জানে ঈশ্বররূপী সেই শয়তানটা। মন্ত্রবলে সে তোমার সর্বস্ব শুষে নিচ্ছে। আর তুমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার উপাসনা করছে।হঠাৎ লোকটা আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললো, ঈশ্বর তৈরি থেকো।সময় আর বেশি নেই।

লোকটার কথা শুনে সবাই একটু ভয় পেলো। কয়েকজন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো, তখনো সারা আকাশ গনগনে আগুনের মতো লাল।

সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছিলো একটা চৌদ্দ বছরের ছেলে, যে মজা দেখবে বলে এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো।অথচ লোকটার অদ্ভুত আচরণ ওকে ভয় পাইয়ে দিলো।

একজন দু'জন করে সবাই বাড়ির পথে পা বাড়ালো।বলাবলি বললো, আরো কতো কী যে শুনতে হবে কে জানে।লোকটা তবু বলে চললো, তোমাদের যে চারা গাছের কথা বলেছি আমার কাছে একটাই আছে। সবাইকে আজ দিতে পারবো না। একজনকেই দেবো।

ততোক্ষণে সবাই চলে গেছে।একজনই শুধু দাঁড়িয়েছিলো জড়োসড়ো হয়ে।সে হলো ভয় পাওয়া সেই ছেলেটা, যার ঘর বলতে পথ আর গাছের তলা ছাড়া অন্য কিছুই নেই। তাই ওর কোনো গন্তব্য ছিলো না।

লোকটা হঠাৎ ছেলেটাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো।খুশিতে চেঁচিয়ে উঠে বললো, এই যে রাজাধিরাজ! তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম।কোথায় ছিলে তুমি? তুমিই যে সে।

ছেলেটার মনে হলো, লোকটাকে ভয় করার কোনো কারণ নেই, বরং ওকে এখন বন্ধুর মতো মনে হচ্ছে।বললো, তোমার সেই চারাগাছ কি আমাকে দেবে?

আদর করে ছেলেটার কপালে চুমু খেয়ে লোকটা বললো, বোকা ছেলে, এখনো কি বুঝতে পারলে না? আমার সবকিছু তোমার জন্যে।

ছেলেটা তখন আস্তে আস্তে লোকটাকে বললো, জানো, সবাই তোমাকে পাগল আর যাদুকর বলছিলো।

বলতে পারে!' লোকটা হেসে জবাব দিলো, তুমি তো আর বলছো না! আর পাগল বললে কোনো ক্ষতি নেই।ওরা তো আমায় শয়তান বলেনি! তাহলেই হলো।ওরা এটাই জেনে গেলো আমি শয়তানের দলের লোক নই।

ছেলেটার অভিমান হলো, যেন তাকেই কেউ পাগল বলছে! তা হোক।তবু পাগলই বা কেন বলবে?

লোকটা এবার খুব সুন্দরভাবে হাসলো।বললো, জানো, অনেকেই জানে না শয়তানটা যে ঈশ্বরের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।আর এটাও অনেকে জানে না ওরা সবাই ভীষণ এক ফাঁসিকাঠে ঝুলছে।আমি জানি।এটাও জানি আগামীকাল কী ঘটবে।শয়তান আর তার চ্যালাগুলোকে কীভাবে খতম করতে হবে।সবাই যখন বুঝতে পারবে তখন আর কেউ আমাকে পাগল বলবে না, বুঝলে?

ছেলেটা এমনভাবে মাথা নাড়ালো যেন সে সবই বুঝেছে। লোকটা আবার হাসলো, আমি জানতাম তুমি বুঝবে।সে জন্যেই এই চারাগাছ তোমাকে দিচ্ছি।এটাকে যত্ন করে মাটিতে লাগাবে।সাবধান থেকো, শয়তানের ছায়া যেন এর গায়ে না পড়ে।তাহলে এটা

মরে যাবে। জানো, আমার অনেকগুলো চারাগাছ ছিলো। শয়তান সারাক্ষণ ওগুলোকে খুঁজছে। ওর চ্যালারা ওগুলোকে মেরে ফেলেছে।

ছেলেটা বললো, আমার ভয় হচ্ছে। আমি একা কীভাবে এটা বাঁচিয়ে রাখবো?

লোকটা ওকে আদর করে বললো, তুমিই পারবে এটাকে বাঁচাতে। আমার ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করবেন। তিনিই বলবেন কীভাবে শয়তানের বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

ছেলেটা অবাক হয়ে বললো, কোথায় তোমার ঈশ্বর?

লোকটা গভীর বিশ্বাস নিয়ে বললো, তোমার বুকে! তোমার মতো যারা সব হারানোর দলে, আমার ঈশ্বর তাদের সবার বুকের ভেতরে ইচ্ছা হয়ে বাস করেন। আর এই চারাগাছের ভেতর—এই বলে লোকটা ছেলেটার হাতে চারাগাছটা গুঁজে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে অন্ধকারে হারিয়ে গেলো।

আর সেই ছেলেটা শীতের কুয়াশা ঢাকা অন্ধকারে এক বিশাল মাঠে চারাগাছটা হাতের মুঠোয় নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, যে চারাগাছ তার সারা শরীরে একরাশ বিশ্বাস আর সাহসের উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছিলো।

শহরে সকল সুখ

দিনের পর দিন গ্রামগুলো সব যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে।মানুষগুলোও আর আগের মতো নেই।গ্রামের ছেলে ধলু অবাক হয়ে দেখে।অনেক আগের কথা মনে পড়ে যায়।নদীতে যখন ভাটা নামতো বহু দূর অবধি নরম ভেজা বালি চিকচিক করতো।নদীর তীরে বসে সেই বালি দিয়ে ধলুরা ঘর বানাতো।তার পর যখন জোয়ার আসতো, নদীতে মাতাল পানির ঢল নামতো, ধলুদের বালির ঘরগুলো ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়তো।জোয়ারের ঘোলা পানিতে সব তলিয়ে যেতো।

নদীতে এখন আগের মতো জোয়ার আসে না।স্রোতটা মরে গেছে।কখনো সরু ধারায় একটুখানি পানি বয়ে যায়।নইলে এপার ওপার শুধু বালি ধু ধু করে।রোদে তামাটে হয়ে বাতাসে হু হু করে ওড়ে।ছোট ছোট ঘূর্ণি হয়ে আকশে হারিয়ে যায়।

ধলু বসে থাকে সেই ধু ধু বালির চরে।বসে বসে শুধু ভাবে।দূরে দাদি ডেকে ডেকে ফেরে।কাছে এসে বলে তরে লইয়া আর পারি না।কোন সুম খনে তরে ডাকতাছি।আর তুই বইয়া রইছস এইহানে? ল, ঘরে যাই।

শুকনো, কঠিন, ফেটে যাওয়া মাটির আলপথ ধরে ধলু দাদির সঙ্গে ঘরে ফেরে।যতদূর চোখ যায় ফসলের শুকনো মাঠ খা খা করে।মনে হয় না কোনোদিন এ মাঠ ফসলের ভারে সবুজ ছিলো।মনে হয় না কোনোদিন এ মাঠে সোনালি ফসল কাটার আনন্দ নেমে আসতো।মনে হয় এ মাঠ চিরদিনই এমন ছিলো।হা-করা মস্তো ফাটলগুলো কঙ্কালের খুলির মতো।অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখলে ভয় লাগে।পুরো মাঠটাকে প্রকাণ্ড এক কঙ্কাল মনে হয়।

দাদি বিড়বিড় করে, আল্লা, এ কি গজব নাযেল করলা।মানুষগুলা এমন ওইয়া গ্যালো ক্যান? কোন সর্বনাশের টানে মানুষ গ্যারাম ছাড়তাছে?

ধলু চেয়ে দেখে, দূরে শহরে যাবার রাস্তায় পিঁপড়ের মতো মানুষ।জোয়ারে বালির ঘরের মতো গ্রামগুলো চুর চুর করে ভেঙে যাচ্ছে।ভাঙা গ্রামের মানুষ শহরে যাচ্ছে। নিজের মনে প্রশ্নগুলো গলাকাটা মুরগির মতো ছটফট করে–কিসের জোয়ার? মানুষ ক্যান শহরে যাইতাছে?

দাদি বলে, সর্বনাশের জোয়ার।সর্বনাশের টানে মানুষ শহরে যাইতাছে।

গ্রামের মানুষদের ওপর ধলুর বাবার ভীষণ রাগ।যখন মানুষ প্রথম গ্রাম ছাড়তে শুরু করলো তখন থেকেই তার রাগ।দিন দিন এই রাগ শুধুই বেড়ে চলছিলো।কারণ গ্রাম ছাড়ার মানুষও দিন দিন বাড়ছিলো।

একদিন হাঁদাই মাতবর তার সবকিছু গুছিয়ে নিলো।পান চিবুতে চিবুতে এসে ধলুর বাবাকে বললো, বুঝলা ধলুর বাপ, চিন্তা কইরা দেখলাম গেরামে থাকনের কোন সুখ নাই।ঠিক করছি শহরেই যামু।

মাতবরের অনেক পয়সা।কেউ মাতবরের কথার ওপর কথা বলে না।তবু ধলুর বাবা না বলে পারলো না, আপনে ক্যান শহরে যাইবেন? গ্যারামে আপনের কিসের কষ্ট?

একদলা পানের পিক থুক করে ছুঁড়ে দিয়ে হাঁদাই মাতবর বললো, দূর দূর।গ্যারামে সুখ আছে? সকল সুখ ওইলো গিয়া শহরে।

ধলুর বাবা ধারালো গলায় বললো, এতোদিন তো সুখেই আছিলেন।

অন্য কোন সময় হলে হাদাই মাতবর চটে যেতো।শুধু চলে যাচ্ছে বলেই বললো, তোমারে কইতে আপত্তি নাই ধলুর বাপ।সুখ কই দ্যাখতাছ গ্যারামে! কারে লইয়া সুখ করুম? গ্যারামের মানুষগুলান সব শহরে চইলা যাইতাছে।ট্যাহা পয়সা, জমি জিরাত যা আছে এগুলান খাটামু কোনহানে? মানুষ থাকলেতো ট্যাহা পয়সা খাটাইয়া সুখ আছে! গ্যারামে মানুষই নাই।

কথাগুলো শুনে ধলুর বাপের এতো বেশি ঘেন্না লাগলো–সে আর কোনো কথাই বলতে পারলো না।হাঁদাই মাতবর আবার বললো, চিন্তা কইরা দেখলাম, ভালই ওইবো শহরে গিয়া। জুতমতন কারবার করন যাইবো। আমার পোলায় ঠিকাদারী আর পারমিটের কারবার কইরা চাইরতালা দ্যালান দিছে। কত মানুষ খাটতাছে পোলার কারখানায়। দেখলেও বুকে শান্তি আসে।দিন রাইত কাম করে।

ধলুর বাবার কোনো কথা বলার ইচ্ছে হলো না।তবু পান চিবুতে চিবুতে হাঁদাই মাতবর বললো, বুঝলা ধলুর বাপ, আমিও পোলারে কইয়া দিছি, আমাগো গ্যারামের মানুষগুলানরে য্যান হ্যাঁগো কলে কারখানায় কাম কাজ দিয়া দ্যায়। মাইনষের দুঃখ বুঝলা, আমি সইয্য করতে পারি না। গ্যারামের মাইনষেগোরেও কইয়া দিছি শহরে গিয়া য্যান পোলার কারখানায় কাম লয়।ভালোই ওইবো।কি কও ধলুর বাপ?

ধলুর বাবাকে এবার বলতেই হলো, ভালা আর ওইলো কই! এইহানে থাকতে আপনের জমিতে কাজ করতো।শহরে গিয়া আপনের পোলার কারখানায় কাজ করবো।ভালাটা কই আমিতো দ্যাখতাছি না।কারখানায় কাম কইরাতো আর রাজা উজির ওইবো না।

পানের পিকটাকে গলার ভেতর রেখে খ্যাক খ্যাক হাসতে লাগলো হাঁদাই মাতবর তুমি বুঝবা না, বুঝলা ধলুর বাপ! তুমি বুঝবা না।বুঝছে ধনাই মণ্ডল।আমাগো মতন মানুষ ছাড়া কেউ বুঝবো না। ধনাইরে আমি কওনের লগেই রাজী ওইয়া গ্যাছে। ধনাইর শহরেও কায়-কারবার কম না।তা তুমি যদি যাও তোমারেও কারখানায় ভালা চাকরী একখান দিবার পারুম।

না।ধলুর বাবা চাবুকের মতো গলায় হিস হিস করে বললো, আমি যামু না।

বিচ্ছিরি শব্দ করে গলায় জমে থাকা পানের পিকগুলো ফেলে হাঁদাই মাতবর বললো, তোমাগোরে ভালা কথা কওন ওইলো আহামুকি।গ্যারামে বইয়া না খাইয়া মর।

রেগেমেগে চলে গেলো মাতবর।

সেই থেকে ধলুর বাবার রাগ আরো বেড়ে গেছে।ধলুকে বলে, তোরে কইয়া রাখলাম ধলু।দেখিস, শহরে একটা মানুষও সুখে নাই।সুখ ওইলো হাঁদাই মাতবর আর ধনাই

মণ্ডলগো লাইগা।হ্যাঁগো গ্যারামেও সুখ।শহরেও সুখ ।আমাগো বাঁচতে ওইবো গ্যারামে থাইকা।

ধলু বলে, গ্যারামে থাইকা খাইবা কি বাবা? ফসল কই? চাষ করবো কে? হাল বলদ কই? খাল কাটবো কে? মানুষ কই?

ধলুর বাবার চোখ দুটো তখন ফসলের মাঠের মতো রুক্ষ আর কঠিন হয়ে ওঠে।বিড় বিড় করে বলে, ঝড় তুফান খালি গ্যারামেই অয়।শহরে যদি একখান তুফান উইঠা সব সমান

ওইয়া যাইতো তাহলে মানুষ গ্যারামে ফিরা আসতো, ফসল ফলাইতো, সুখে থাকতো।

দাদি শুধু একটা কথাই বলে, আল্লা তোমার এমুন অবিচার ক্যান? আমাগো সোনার মাইনষেগো ক্যান শহরে নিতাছ? তোমার কইলজায় এটু দয়া মায়াও নাই?

ধলুর বাবা শুনে রেগে যায়–মা তুমি কেমুন কথা কও? আল্লায় কি শহরে বইসা মাইনষেগো ডাকতাছে? ডাকতাছে শয়তানে।শয়তানের ডাকে মানুষ শহরে যাইতাছে।

দাদি বলে, আমি বুঝি না বাপ, শয়তানে এত জোর কই পায়।অখনো তো আকাশে চান সূরু ওডে।

ধলুদের পাশের বাড়ির ফুলিরাও একদিন শহরে চলে গেলো। ধলুর ভীষণ খারাপ লাগলো।ফুলি ধলুর বন্ধু।ফুলির বাবা, ধলুর বাবার বন্ধু।অনেক দিনের বন্ধু।তবু সেই বন্ধুকে ছেড়ে চলে গেলো।

খবর পেয়ে ধলুর বাবা ছুটে গিয়েছিলো ফুলির বাবার কাছে –ক্যান ফুলির বাপ? তোমরা ক্যান শহরে যাইবা? তোমাগোতো ধনাই মণ্ডল আর হাঁদাই মাতবরের মতন কারবার নাই।ক্যান যাইবা তোমরা?

অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে ওঠে ধলুর বাবা।ফুলির বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।তারপর আস্তে আস্তে বলে, আমার কি কম কষ্ট ওইতাছে ধলুর বাপ।অনেক দুঃখ বুকে লইয়া শহরে যাইতাছি।শহরে দুইডা খাইয়া বাঁচবার পারুম।গ্যারামে তো কিছুই নাই।বলতে বলতে ফুলির বাবা কেঁদে ফেলে, বাপ দাদার ভিটা-মাটি ছাইড়া যাইতাছি।বুঝতাছ না কত কষ্ট বুকের মইধ্যে!

বুঝি ফুলির বাপ।ধলুর বাবা সান্ত্বনা দিয়ে বলে, বুঝি সবই।এইডাও বুঝি এই গ্যারাম আর গ্যারামের মাইনষেগো রক্ত দিয়ে শহরের কল কারখানা আর কারবার চলতাছে। বুঝলা ফুলির বাপ।আমরা বড় বেশি সস্তা ওইয়া গেছি।

সমস্ত গ্রামটা, সমস্ত গ্রামগুলো খা খা করে।সকালে সূর্য ওঠে পাতাঝরা মরা গাছগুলোর ভেতরে।দুপুরে ধু ধু কঙ্কালের মাঠে আগুন ঝরায়।সন্ধ্যেবেলা শুকনো নদীর হু হু চরে একসময় জ্বলতে জ্বলতে নিভে যায়।রাত নামে।ভূতুড়ে অন্ধকারে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস গ্রাম থেকে গ্রামে ফেরে।

সব কিছু শূন্য মনে হয় ধলুর।হু হু চর, ফ্যাকাশে আকাশ, খরায় ধু ধু মাঠের কুৎসিৎ ফাটলগুলো–সব যেন অর্থহীন হয়ে গেছে ধলুর কাছে।ধলু ভাবে।ধলুর বাবা চুপচাপ বসে থাকে দু'চোখে দুপুর সূর্যের আগুন নিয়ে।ধলুর দাদির দীর্ঘশ্বাস আর হা হুতাশ বাতাসে হারিয়ে যায়।ধলুর মনে হয় সমস্ত পৃথিবীটা ধীরে ধীরে জমে যাচ্ছে।স্থির হয়ে যাচ্ছে।

সেদিন রাতে ধলুর স্থবির পৃথিবীতে ঝড় উঠলো–ফুলিদের চলে যাবার অনেকদিন পর, যেদিন ফুলির মা গ্রামে ধলুদের উঠোনে আছাড় খেয়ে পড়লো।ফুলির বাবা আর বেঁচে নেই।কারখানা তাকে গিলে খেয়েছে।একটু অসাবধান হয়েছিলো বুঝি।পুরো শরীরটা থেতলে একাকার হয়ে গেছে।দয়া দেখিয়ে মালিক পুষবার জন্যে ফুলিকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে।

সেই রাতে ঝড় এলো।সারা আকাশ অন্ধকার করে প্রকাণ্ড কালো কালো মেঘগুলো সব কিছু ওলোট পালট করে দেয়ার জন্যে দৈত্যের মতো ছুটে এলো।সারারাত ঝড়ো বাতাস দাপাদাপি করলো।

শেষ রাতে ধলুকে ঘুম থেকে ডেকে তুললো ওর বাবা।বললো, চল যাই।

কোথায় বাবা? ধলু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো।

শহরে।ধলুর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখলো ওর বাবা।তারপর গভীর বিশ্বাসের গলায় বললো, শহরে সুখের ঘরে আগুন লাগামু।

বইয়ের নামঃ *একাত্তরের যীশু*
লেখকঃ *শাহরিয়ার কবির*
ভাষাঃ বাংলা
বইয়ের ধরণঃ *গল্পগ্রন্থ*
প্রকরনঃ ইপাব (epub), মোবি(mobi)
পঠন সৌজন্যতাঃ ইবাংলা লাইব্রেরী
ই-বই তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ